কিন্তু পরমসুন্দর স্বামীর মনোমত হইতে পারিলাম না। শ্বশুর প্রচুর অর্থলোভে তাঁহার পুত্রের জীবন অসুখী করিয়া তাঁহার গৃহে আমাকে স্থান দিলেন এগার বছরে আমার বিবাহ হয়। সেই বয়সে অনেক বালিকাই কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু অবস্থাবিশেষে আমি তাঁহার মনের অশান্তির কারণ বুঝিতে পারিলাম। আমার শ্বশুরের নাম, স্বামীর পরিচয় ও দেশের নাম কিছুই বলিব না। আমার যে পরিচয় দিলাম, তাহাতেই তোমার স্বামী আমাকে বিশেষ-রূপেই চিনিতে পারিবেন এবং তুমিও আমাকে বুঝতে পারিবে। আমার সহিত অশ্রদ্ধা ও অনিচ্ছার সহিত তিনি কথাবার্ত্তা ও ঘরসংসার করিতেন। অভাগিনী আমি! তাঁহাকে তখন আমি ইচ্ছাসত্ত্বেও মুক্তি দিতে পারি নাই। তাহার কারণ, আমার শ্বশুরঠাকুর। তিনি আমাকে বড়ই স্নেহাদর করিতেন। সেই নিরাশামণ্ডিত অন্ধকারময় শ্বশুরালয়ে আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল ও আকর্ষণের বস্তু তিনিই ছিলেন। তিনিও সমস্ত বুঝিতে পারিয়া পুত্রকে কত তিরস্কার করিতেন, কিন্তু আমি ভাবিতাম, কেন তিনি এ চেষ্টা করিতেছেন? জোর করে কি ভালবাসা যায়? যদিও বুঝিতাম, তিনি আমার উপর স্নেহবশতঃ ঐরূপ করিতেন, কিন্তু তাঁহার এরূপ চেষ্টায় আমি লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইতাম। অভাগিনীর এ সুখটুকুও, বুঝি, বিধাতার সহ্য হইল না! তিন দিনের জ্বরে আমার শ্বশুর আমাকে ঘোরতর অন্ধকারে ফেলিয়া পর-লোকে চলিয়া গেলেন। আমার দুঃখ ষোলকলায় পূর্ণ হইল। শ্রাদ্ধশান্তি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। আমার স্বামীর ভাবান্তর দেখিলাম। তিনি বাহিরে বাহিরে বেড়াইয়া বেড়ান; গৃহে খুব কমই থাকিতেন। অবশেষে একদিন তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, তিনি পিতৃ-শোক-সংবরণের জন্য কিছুদিন ধরিয়া বিদেশে ভ্রমণ করিতে যাইবেন। শুনিয়া নীরবে রহিলাম বটে, কিন্তু হৃদয় পুড়িয়া গেল; বুঝিলাম, কি জন্য এ গৃহত্যাগ; পিতার দোহাই কেন মিথ্যা দিলেন? এতদিনে যাহা করিতে পারি নাই, সে দিন তাহা করি-লাম। স্বামীর অনুমতি লইয়া চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেলাম। শুন্‌বে শান্তি, তখন আমার বয়স কত? পনের বৎসর বয়সে জীবনের সর্ব্বসুখে বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসিনী হইলাম! আর বিশেষ কিছু বলিবার নেই। যখন পিত্রালয়ে আসিলাম, তখন বিজয়া অভাগিনীর গর্ভে। তিনি কিছুই জানেন না; আমিও স্বামি-গৃহত্যাগকালে বুঝিতে পারি নাই। বিজয়ার ভূমিষ্ঠ হইবার পর অর্থাৎ আটমাস পরে রটাইয়া দিলাম যে, অভাগিনীর মৃত্যু হইয়াছে। পিতাকে অনেক কষ্টে এ সংবাদ রটাইতে সম্মত করাইয়াছিলাম। আমার স্বামী এ মৃত্যুসংবাদে কিছু অবিশ্বাস করিলেন না. কোন খোঁজ-খবরও লইলেন না। বোধ হয়, মুক্তির ও তৃপ্তির একটা ক্ষুদ্রনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনের ভার লঘু করিয়াছিলেন। কন্যার জন্মের কথাও তাঁহাকে শুনান হয় নাই। কিছুদিন পরেই শুনিলাম যে, তিনি একটী পরমসুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করিয়া সুখে ঘরসংসার করিতেছেন। আমিও আর তাঁর কোন খোঁজ লইতাম না; পাইতামও

না। শুন্‌লে ত শান্তি, অভাগিনী, দুঃখিনী, পতিপরিত্যক্তার জীবনকাহিনী? চলিলাম;—কোথায় জানি না।—কোনও অনুসন্ধান কোরো না। আশীর্ব্বাদ করি তোমায়, তুমি স্বামী-সোহাগে সোহাগিনী হয়ে চিরদিন সুখে স্বচ্ছন্দে থেক। বিদায় শান্তি!—

দুঃখিনী
কমলা"

সে-দিন বিমলের ছুটী ছিল। আহারের পর বিশ্রামের সময় শান্তি আসিয়া সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "দেখ, দিদি আমার নামে একটা পত্র লিখে গিয়েছেন; বাস্তবিক পড়্‌লে তাঁর জন্য বড় দুঃখ হয়। দিদির জীবনে কোনও সুখই নেই। রং ময়লা হলেই কি অন্তরও কাল হবে? দিদির মতন মেয়ে আর হয় না; কি ভয়ানক নিষ্ঠুর তাঁর স্বামী! আমার কিন্তু মনে হয়, দিদির প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু, প্রত্যেক উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে তাঁর সপত্নী ও স্বামীর কখনও মঙ্গল হয় নি; বোধ হয় কখন হবেও না। দেখ, দিদির জীবনকাহিনী পড়ে, কি রকম দুঃখময় জীবন তাঁর!"

বিমল চিঠিখানি লইয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তাহার চক্ষু দিয়া অজস্রধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আদ্যোপান্ত পড়িয়া দুইহস্তে চক্ষু চাপিয়া নীরবে সে বসিয়া রহিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত দেহ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল, "উঃ, শান্তি, এস, এস, শীঘ্র আমার কাছে এস। আমার বুকের মধ্যে কি রকম কর্‌ছে! জ্বলে গেল, পুড়ে গেল!" বলিতে বলিতে বিমলের মাথা বিছানার উপর ঢলিয়া পড়িল। শান্তি বিমলের সহসা এরূপ অবস্থা দেখিয়া ভীত হইল; নিজক্রোড়ে মস্তক উঠাইয়া লইয়া জলআছ্‌ড়া দিয়া পাখার বাতাস দিতে লাগিল। একটু সুস্থ হইয়া বিমল বলিল, "শোন শান্তি, আমার জীবন-কাহিনী তুমিও শোন। এতদিন তোমাকে কিছুই বলি নাই; এবং তখন ভাবিতাম যে, বলিবার কিছুই নাই। হতভাগিনী কমলা আমারই প্রথমপক্ষের স্ত্রী। চমকাইও না শান্তি! সমস্ত স্থির হইয়া শোন, নিষ্ঠুর স্বামীর পাপকাহিনী শোন। বিবাহকালে আমার উচ্চআশা ছিল, আমি অর্থ লইব না, কিন্তু কন্যা দেখিতে সুন্দরী হইবে। পিতৃদেব আমার সে সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দিলেন। কমলাকে বিবাহ করাইয়া প্রচুর অর্থ আনিলেন; কিন্তু সে আমার মনোমত সুন্দরীও হইল না! আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু একদিনের জন্যও তাহার প্রতি কোনও অযত্ন বা কর্ত্তব্যের ত্রুটী করি নাই। পিতার মৃত্যুর পর তাহার সঙ্গ যখন অসহ্য হইল, গৃহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। সতী-সাধ্বী কমলা তাহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে শান্তি দিয়া চিরদিনের জন্য পিত্রালয়ে চলিয়া গেল; কিছুদিন পরে তাহার মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম। সত্যকথা বলিতে কি, তাহার জন্য আমার বিশেষ কিছুই কষ্ট হইল না। সেই বৎসরেই কয়েকমাস পরেই তোমাকে বিবাহ করিলাম। তুমি আমার মনোমত সুন্দরী স্ত্রী হইলে। তোমাকে লইয়া আমি সোনার সংসার পাতিলাম। মাঝে মাঝে সুখে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভাবিতাম যে, কমলার যদি সহসা মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে

তোমাকে পাইতাম না, এ মধুর প্রেমের, এ অনাবিল সুখশান্তির আস্বাদও পাইতাম না। সে জন্য মনে মনে তাহার মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করিতাম। কিন্তু শান্তি! এ পৃথিবীতে যে নিষ্ঠুর অন্যকে সুখ, শান্তি, সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করে, দণ্ডদাতা বিধাতা যে তাহাকেও নিক্তির ওজনে শাস্তি দিয়া থাকেন, তাহা তখন জানিতাম না। আমাদের দুইজনের মধুর বিশুদ্ধ প্রেমের পরিণাম সেই দিব্য সুন্দর শিশু, আমাদের প্রাণের ধন বিনয়কুমার আজকার নিষ্ঠুরতার জন্য এ সংসার হইতে চলিয়া গেল? কমলার প্রতি আমার নিষ্ঠুরতার ফলে যে আমরা তাহাকে হারাইয়াছি, তাহার কি কোনও সন্দেহ আছে, শান্তি? কিন্তু আমার জন্য তোমার এ শাস্তি কেন? বুঝি, আমার পত্নী হয়েছ বলেই তোমার উপর এ অভিশাপ। এখন বুঝেছি, কমলা কেন আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিত না; কেন সে বিজয়াকে আমার হাতে দিয়া গেল, আর কেন নিজ কন্যার শুভবিবাহে সে যোগদান করিল না? একদিন যে অভিমানিনী কমলা আমার সুখের জন্য নিজ সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন দিয়া আমার গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, আবার সেই কমলা কিরূপে আমার বিনা আহ্বানে সেই গৃহে পদার্পণ করিবে? ধনিকন্যা সে, তাই বলিয়া সে ধনমদে গর্ব্বিতা বা বিলাসিনী নহে। সেই চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে তাহার কর্ম্মকুশলতা, স্বার্থত্যাগ, নিরলসতা, সহ্যশক্তি, শ্বশুরের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও যত্ন, স্বামীর প্রতি নীরব একাগ্র ভালবাসা দেখিয়া আমি বাস্তবিক বিস্মিত হইতাম। এই সব গুণের জন্যই আমার পিতা কমলার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, 'বউমা' বলিতে অজ্ঞান হইতেন।"

বিমল চুপ করিল; উভয়েই নীরব। বহুক্ষণ পরে সে গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শান্তি বলিল, "এতদিন এ-সব কথা বল নাই কেন? এ-সব জানিলে দিদিকে কি কখনও ছাড়িয়া দিতাম? দিদির স্বামী, দিদির সংসার, দিদির কন্যা, আমি কোন্ অধিকারে অধিকার করিয়া বসিয়া আছি? তাঁকে তুমি এনে দাও। তাঁর স্বামী, কন্যা, ঘর-সংসার তাঁকে দিয়ে আমি তোমাদের সেবা করে তোমাদের স্নেহের ছায়ায় সুখে ও শান্তিতে বাস করি। অভিমানিনী দিদি আমার, সেইজন্যই সপত্নীকে যাইবার পূর্ব্বে কোনও আভাস দিয়া যান্ নাই। আর না, তোমার জন্য দিদি গৃহত্যাগিনী, রাজরাণী হয়েও আজ পথের ভিক্ষারিণী, নবীন যৌবনে সন্ন্যাসিনী! আর পাপের ভার পূর্ণ করিতে দেব না! যাও তুমি, দিদির অনুসন্ধান কর, গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

অনুতপ্ত বিমল চারিদিকে খোঁজ করিল; দেশবিদেশে, যেখানে কমলার যাওয়া সম্ভব, সব জায়গাতেই অর্থের মায়া না করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। শান্তি ও বিমল নিরাশ হইয়া পড়িল। বিজয়া ৭ দিন পরেই শান্তির নিকট ফিরিয়া আসিল। তখন শান্তি তাহার নিকট প্রকৃত ঘটনা কিছুই খুলিয়া বলিল না।

(৫)

কমলার অন্তর্হিত হইবার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একদিন প্রাতঃকালে বিমল তাহার বাটীর বারান্দায় বসিয়া আছে, সহসা

এক অতিশয় অপূর্ব্ব বস্তু তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। সে দেখিল, তাহার বাটীর সম্মুখের ক্ষুদ্র উদ্যান পথে দীর্ঘ, উন্নত, শুভ্রবর্ণ জটাকুল-সমাচ্ছন্ন, গৌরবর্ণ, সৌম্য-স্নিগ্ধ ভস্মাচ্ছাদিত এক সন্ন্যাসী আসিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বারাণ্ডায় আসিয়া উঠিলেন। বিমল তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে ব্যস্তভাবে উঠিয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী নিজ ব্যাঘ্রাসন পাতিয়া উপবেশন করিবার পর, বিমল অতিবিনীত ভাবে তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। বিমল সেই অবসরে সন্ন্যাসীকে দেখিতে লাগিল।—কি জ্যোতিঃপূর্ণ, হাস্যময় প্রশান্তমূর্ত্তি! বয়স—আশীর উপরেই হইবে। এই জ্যোতিষ্মান্ অশীতিপর সংসারত্যাগী বৃদ্ধকে দেখিলে স্বতঃই ভক্তিশ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী বলিলেন, "আপনার নামই, বোধ হয়, শ্রীমান্ বিমলকুমার রায়। মা-লক্ষ্মী এই পত্রখানি আপনাকে দিতে বলিয়া গিয়াছেন এবং আমি স্বহস্তে যেন দিই, ইহাই তাঁহার শেষ অনুরোধ ছিল। পত্র পরে পড়িবেন, অগ্রে আমার বক্তব্যটা একটু শুনুন। বৎসর-দুই পূর্ব্বে কমলা-নামে এক মা-লক্ষ্মী কাশীতে আমার নিকট গিয়া আমার আশ্রয়-ভিক্ষা করেন্ ও এতদিন তিনি আমার নিকটেই কন্যারূপে ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে সংসার-ত্যাগ করিয়া পুনরায় মায়াজালে জড়াইয়া পড়িলাম। তাঁহার কিন্তু কোনও পরিচয় পাই নাই!—মা আমার সাক্ষাৎ কমলাই ছিলেন। যাহা হউক ১৫ দিন পূর্ব্বে সতীলক্ষ্মী মা আমার, আমার শূন্য আশ্রয় পুনরায় শূন্য করিয়া এ মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি আবার আমার সেই শূন্য আশ্রয়ে ফিরিয়া যাইতেছি। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করি, সেই সতীলক্ষ্মী কমলার আপনি কে হ'ন?"

বিমলের এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; শূন্যদৃষ্টিতে অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমিই সেই কমলার, সেই সতী সাধ্বীর হত-ভাগ্য স্বামী।" কিয়ৎক্ষণ পরে সে দেখিল, সন্ন্যাসী নাই। কখন চলিয়া গিয়াছেন, তাহা সে জানিতে পারে নাই। পত্রখানি পড়িয়া রহিয়াছে। বিমল বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কমলা চলে গেলে, চিরদিনের জন্য অপরাধী করে রেখে গেলে? একবার ক্ষমা চাহিবার অবসরও দিলে না? যাও কমল, যে রাজ্যে শান্তি আছে, প্রেমের প্রকৃত প্রতিদান যে রাজ্যে আছে, যাও সেখানে! আমার প্রায়শ্চিত্ত ইহজগতে শেষ হইলে পুনরায় মিলিত হব, তখন আমাকে ও শান্তিকে ক্ষমা কর্‌বে ত?"

পত্র খুলিয়া বিমল দেখিল কমলা স্বহস্তে মুক্তাক্ষরে লিখিয়াছে—"আমার যাবতীয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমার কন্যা ও জামতাকে দিবেন, বাকী অর্দ্ধেক দিয়া অনাথ ও দুঃখীদের সাহায্যের জন্য একটী আতুরাশ্রম খুলিবেন। চলিলাম। যদি মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, তবে পরলোকে পুনরায় সাক্ষাৎকার হইবে। শান্তি ও বিজয়াকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন ও আপনার চরণে শতকোটী প্রণাম।

হতভাগিনী কমলা।"

* * *

বিজয়া ও শান্তি সমস্তই শুনিল। বিজয়া মাতার আশীর্ব্বাদে স্বামিসৌভাগ্যে গর্ব্বিতা। আর শান্তি কমলার কথা উঠিলেই কাঁদিয়া আকুল।

সকলে দেশে ফিরিয়া আসিল। বিমল কার্য্য ছাড়িয়া দিল। অর্থের ভাবনা তাহার ছিল না; পিতার প্রচুর অর্থের অধি-কারী সে। বিমল "কমলালয়" নাম দিয়া দেশে একটী সুবৃহৎ অনাথাশ্রম খুলিল। সে ও শান্তি দরিদ্র ও মাতাপিতৃহীন শিশুদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিল।

শ্রীসুষমা সিংহ।

সোনার বাংলা দেশ।

(কোরাস্)

বন্দি মা তোর চরণ চুমি, আমার সোনার জন্মভূমি,
বিশ্বপ্রেমের শোলোক-রচা তোর ওই বেদীর তলে,
উদার আকাশ স্নিগ্ধ বাতাস অমলধবল জলে ;

(পূর্ণ কোরাস্)

লুটিয়ে দে মা আমার মাথা ঘুচিয়ে সকল ক্লেশ।
নিখিল নরের ধাত্রী যে তুই সোনার বাংলা-দেশ !

(কোরাস্)

ছন্দে ছন্দে গঙ্গামাতা, বন্দে কাহার পুণ্য গাথা,
চন্দনেরি গন্ধ মাখি' মলয় বহে ধীরে,
ভৃঙ্গ কোথায় কমল-বনে মাতাল হ'যে ফিরে !

(পূর্ণ কোরাস্)

মেঘের তলায় দোল দিয়ে যায় কাহার কাজল কেশ !
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলা-দেশ !

(কোরাস্)

সঙ্গীতে কার পরাণ মাতায়, কানন-তরুর পাতায় পাতায়,
ঔষধি কে বইছে স্নেহে মানব-জীবন-দানে,
ভক্ত প্রাণের প্রেমের লহর ছুটলো সে কোন্‌খানে ?

(পূর্ণ কোরাস্)

শ্যামল শোভায় লুটিয়ে পড়ে মধুর মধুর বেশ !
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলাদেশ !

(কোরাস্)

বিজয়-তুষার-মুকুট শিরে, ফুটছে গো রূপ ভুবন ঘিরে,
হাজার কবির হৃদয়-চেরা ললাটে টীপ্ রাজে ;
কার সে মাটী তীর্থ ওরে মর্ত্ত্য ভুবন মাঝে।

(পূর্ণ কোরাস)

কাহার কোলের শীতল পরশ ঘুচায় সকল ক্লেশ ?
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলাদেশ।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

(মহাকবি ৺দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার জন্মভূমি"র সুর)

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 664. —————— December, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ।
৬৬৪ সংখ্যা। } অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। ডিসেম্বর, ১৯১৮। { ১১শ কল্প।
৩য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

পরজ—ঝাঁপতাল।

আমায় ভাবের ভেলায় ভুবন-স্রোতে ভাসাও এবার ভাই!
এই ভয়ের বাঁধন চাইনে কখন, অকূলে কূল নাই বা পাই।
আমায়—নিয়ে চল জগৎ ছেড়ে; সব কলরব শান্ত করে
শূন্য হতে শূন্যান্তরে—দিগন্তে দূরে—
জীবন্ততা সজীব যেথা, প্রান্ত-সীমার অন্ত নাই!
তোমায় আমায় খেল্‌ব সেথা উড়িয়ে পরাণ-পোড়া ছাই;
ভাবের ভেলায় ভুবন-স্রোতে ভাসাও এবার ভাই!
চোখে চোখে মুখে মুখে হৃদয়ে হৃদয়—
মাটীর মানুষ জানে না সে প্রেমের পরিচয়;
মহা স্বচ্ছ মুক্ততাতে বিশ্বছাড়া বিশ্বাসেতে
মহাপ্রাণে প্রাণ মিশাতে ব্যাকুল মরম আকুল তাই।
দণ্ডী খেটে দম যে ছোটে—(এবার) গণ্ডী কেটে মুক্তি চাই!
আমায় ভাবের ভেলায় ভুবন-স্রোতে ভাসাও এবার ভাই।

কথা—শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II র্সা সর্সা । ঋা ঋা র্সা । না ননা । দা দা পা I ক্ষক্ষা পা । দা দা ক্ষা |
আ মায় ভা বে র ভে লায় ভু ব ন স্রো৽ তে ভা সা ও

II

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| গা গা । ক্ষা মা মা I মা মমা । গগা গা গগা । দা ক্ষা । দা না র্সর্সা I
এ বা র ভা ই এ ইভ য়ের বাঁ ধন চা ই নে ক খন

২´ ৩ ০ ১
I না র্সা । ঋা র্সা র্সা । না না । দা ক্ষা দা II
অ কূ লে কূ ল না ই বা পা ই

অন্তরা।

২´
[র্সা র্সর্সা]
আ মায় ৩ ০ ১ ২´ ৩
II ক্ষা দা । না -া না । র্সা ঋা । র্সা না র্সা I না র্সা । না না দদা |
নি য়ে চ ০ ল জ গ ৎ ছে ড়ে স ব ক ল রব

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| দা ননা । না -া না I দা দা । পা পা -ক্ষা । গা গগা । গগা গা -া I
শা ন্ত ক ০ রে শূ ন্য হ তে ০ শু ন্যা৽ ন্ত রে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I পা ক্ষা । গগা -া -ঋা । া -ঋা । মা -া -া I না মা । গগা গা -া |
দি গ ন্তে ০ ০ দূ ০ রে ০ ০ জী ব ন্ত তা ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| দা ক্ষদা । দা না র্সা I র্সা র্গর্গা । ঋা র্সা র্সা । না ননা । দা -ক্ষা দা I
স জী৽ ব যে থা প্রা ন্ত সী মা র অ ন্ত না ০ ই

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I ক্ষা মদা । না -র্সা র্সর্সা । ঋা ঋর্সা । না মা -া I না র্সা । ঋা র্সা -া |
তো মায় আ ০ মায় খে লব সে থা ০ উ ড়ি য়ে প ০

০　১　২´　৩　০　১
। না দা । পা -া ক্ষা I পা ক্ষা । র্গা র্গা র্গা । র্গা র্গর্গা । দা ক্ষদা না I
রা গ　গো ০ ড়া　ছা ই　ভা বে র　ভে লায়　ভু বং ন

২´　৩　০　১
I ননা র্সা । না র্সা র্গা । র্ঋা র্সর্সা । না -দক্ষা দা I I
স্রো৹ তে　ভা সা ও　এ বার　ভা ০০ ই

সঞ্চারী।

২´　৩　০　১　২´　৩
I I র্সা র্সা । র্ঋা র্সা -া । না দা । দা পা -ক্ষা I ক্ষা পা । দা -া ক্ষা ।
চো খে　চো খে ০　মু খে　মু খে ০　দ্ব ন্দ　দ্বে ০ দ্ব

০　১　২´　৩　০　১
। র্ঋা -া । -র্ঋা -া সা I না সা । গা -া গা । গা গা । ক্ষা দা না I
দ্ব ০　০ ০ য়　মা টি　র ০ মা　দু খ　জা নে না

২´　৩　০　১　২´　৩
I র্গা র্সা । র্গা -া র্গা । র্ঋা র্ঋা । না -দা -ক্ষদা I না র্সা । র্ঋা -া নর্সা ।
সে প্রে　মে ০ র　প রি　চ ০ ০য়　ম হা　স্ব ০ চ্ছ

০　১　২´　৩　০　১
। র্সা র্সর্সা । না র্সা -া I না র্সর্সা । না -া দা । দা ননা । না না -া I
মু ক্ত　তা তে ০　বি শ্ব৹　ছা ০ ড়া　বি শ্বা৹　সে তে ০

২´　৩　০　১　২´　৩
I ক্ষা ক্ষা । গা -া গা । গা ক্ষা । দা না সা I ননা র্সর্সা । র্গা র্ঋা র্সা ।
ম হা　প্রা ০ ণে　প্রা ণ　মি শা তে　ব্যা৹ কুল　ম র ম

আভোগ।

০　১　২´　৩　০　১
। না দাদা । দা -ক্ষা দা I র্গা র্গর্গা । র্সা দা -া । ক্ষর্ক্ষা র্গা । র্ঋা র্সা নননা I
আ কূল　তা ০ ই　দ ণ্ডী　থে টে ০　দম　যে ছো টে এবার

২´　৩　০　১　২´　৩
I র্সা র্গর্গা । র্ঋা র্সা -া । না ননা । দা -ক্ষা দা I র্সা র্সর্সা । র্ঋা র্ঋা র্সা ।
গ ণ্ডী　কে টে ০　মু ক্তি　চা ০ ই　আ মায়　ভা বে র

০　১　২´　৩　০　১
। না ননা । দা দা পা I ক্ষক্ষা পা । দা দা ক্ষা । গা গা । ক্ষা সা সা II II
ভে লায়　ভু ব ন　স্রো৹ তে　ভা সা ও　এ বা　র ভা ই

আত্ম-বিসর্জ্জন।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর।
মণীন্দ্র এবং জয়াবতীর প্রবেশ।)

মণি। আমার কাল টাকা না হলেই নয়। তুমি দেবে কি না, তাই বল?

জয়া। আমার কাছে টাকা নেই। রোজ রোজ আমি টাকা কোথায় পাব?

মণি। রোজ আমি টাকা চাইছি?

জয়া। রোজ নয় ত আর কি? এই এক বছর তিনি মারা গেছেন, এর মধ্যে তুই কত টাকা ওড়ালি বল দেখি? এই ক'দিনেই ত তিন হাজার টাকা উড়িয়ে দিলি।

মণি। হ্যাঁ, টাকার পালক গজিয়েছে, তাই আমি তাঁকে উড়িয়ে দিলুম! কালকে আমার পাঁচ শ' টাকা চাই-ই। কাল পাঁচ শ' টাকা দিও, তার পরে আর না দাও না দেবে।

জয়া। আমার কাছে আর একটী টাকাও নেই।

মণি। দেখি, তোমার লোহার সিন্দুকের চাবিটা দাও দেখি! টাকা আছে কি না দেখি।

জয়া। আমার কাছে লোহার সিন্দুকের চাবি নেই।

মণীন্দ্র। কি হ'ল চাবি?

জয়া। চাবি তোর কাকা নিয়েছে।

মণি। কাকাকে দিয়েছ? তবেই সর্ব্বনাশ ক'রেছ! তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকে পাঁচ শ' খানি টাকা দাও, আর কখনও চাইব না।

জয়া। তুই যখনি নিস, তখনি ত ঐ কথা বলিস্। কিন্তু তার পরে আর মনে থাকে না।

মণী। মাইরি বল্‌ছি মা, আর আমি তোমার কাছে টাকা চাইব না। যে চাইবে সে গাধা, সে ষ্টুপিড। আজ আমাকে পাঁচ শ' খানি টাকা দাও; আমার বড় দরকার।

জয়া। তোর টাকার দরকার কখন নয়? লক্ষ্মী বাপ আমার! অমন ক'রে টাকাগুলো নষ্ট করিস্ নি। এর জন্যে তিনি কত দুঃখ ক'র্ত্তেন্। মর্‌বার সময় তোকে কি ব'লে গেলেন, তা কি মনে নেই? তুই আমার বড় ছেলে। আমার ভরসা তুই। তুই যদি বাবা, এম্নি ক'রে টাকা-কড়ি সব ওড়াবি, তবে আমি আর সব অপোগণ্ড মানুষ কোর্ব্বো কি ক'রে?

মণীন্দ্র। ঐ তোমার এক কথা! কাঁদুনি গাইতে বস্‌লে। আমি কি উড়িয়েছি? বাবার ভাঁড়ার সব ত তোমার কাছে! আমি কি আর তা' জানি না?

জয়া। থাকে, তোদেরই থাকবে।

মণীন্দ্র। সে-টাকা থাকায় ফল? যখন আমার দরকার হবে, তখন যদি টাকা না পেলুম, তবে সে টাকা থেকে আমার কি লাভ? সে থাকা না-থাকা সমান।

জয়া। কিসের দরকার কাল তোর?

মণীন্দ্র। আমাদের বাগানে পার্টী আছে, নাচ্ দিতে হবে! আমি বড় লোকের ছেলে, তাই আমায় সবাই ধরে! এতে আমার মান কত!

জয়া। কায়েতের ছেলে, লেখা-পড়া

শিখেছিস্, বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে গেল ? মানের মুখে আগুন !

মণীন্দ্র। গালাগাল দিও না বল্‌ছি।

জয়া। দোব না গালাগাল ? একশ' বার দোব ! আমাকে যেমন জ্বালাচ্ছিস্ পোড়াচ্ছিস্, এম্নি জ্বালায় নিজে জ্বল্‌বি ! আমাকে যেমন কাঁদাচ্ছিস্ এম্নি তোকে কাঁদতে হবে।

মণীন্দ্র। আরে ম'ল, ভাল ক'রে বল্‌ছি না ? উনি শাপ-গাল দিতে এলেন্ ! এতেই ত আমার সঙ্গে বনে না। পৃথিবীতে জন্মেছি, একটু আমোদ ক'র্ব্ব না ?

জয়া। আমোদের মুখে আগুন ! .... বুভি-ছাড়া আর কি কিছু আমোদ নেই ? ঘরে বসে গান-বাজ্‌না কর্, অমন লক্ষ্মী বৌ রয়েছে ঘরে ! তা' নয় ত ! যত বদ্ ছোঁড়ার সঙ্গে জুটে কেবল বদ্‌খেয়ালি ক'রে বেড়াবি ! একদিন রাত্তিরে বাড়ী থাক্‌বি না !

মণীন্দ্র। (অঙ্গভঙ্গি-সহকারে) আহা, হা ! ম'রে যাই তোমার বোয়ের গুণের বালাই নিয়ে ! চেহারাখানিত মা-কালী ! হাতে খাঁড়া দিলেই হয় !

জয়া। আমি রূপের কথা বলি নি, গুণের কথা বল্‌ছি।

মণীন্দ্র। গুণ ! তাও যে অষ্টরম্ভা ! কি গুণ আছে তোমার বৌয়ের ? তোমার বৌ গান গাইতে পারে ? তোমার বৌ হার্‌মনিয়ম বাজাতে পারে ?

জয়া। গেরেস্ত ঘরের বৌ-ঝি কি গান-বাজ্‌না করে যে, আমার বৌ গান বাজনা ক'র্ত্তে পার্ব্বে ? নইলে আমার বৌ স্বয়ং লক্ষ্মী ! তুই তাকে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা দিস্, সে একটী দিনের জন্যেও মুখ ফুটে কারো কাছে বলে নি। উল্টে তোকে যদি কেউ কিছু বলে ত সে লুকিয়ে কাঁদে, আমি কত দিন দেখিছি। সে একলা আমার এত বড় সংসারটার ভার নিয়েছে ! আমাকে আর কিছু দেখ্‌তে হয় না। বুদ্ধি, বিবেচনা, দয়া, মায়া ঐ কচি মেয়ের কত ! তোর চোক আছে কি যে দেখ্‌বি ?

মণীন্দ্র। না, আমার চোক নেই ! আমি কাণা ! তাই অমন কাল-পেঁচাকে সুন্দরী দেখ্‌তে পাই না। আচ্ছা, তুমি এখন আমাকে টাকা দাও ; বেলা যাচ্ছে, আমাকে এখনি যেতে হবে।

জয়া। কোন্ চুলোয় যাবি যা ! আমি তোকে আর এক পয়সাও দোব না।

মণি। না, দেবে না ? তোমার বাবার টাকা !

জয়া। কি ? কি বল্লি ! আমি তোর মা, দুশমাস দশদিন পেটে ধরিছি, বুকের রক্তে তোকে মানুষ করিছি, তুই আজ আমায় বাপ্ তুল্লি ? নইলেই বা লোকে নেশাখোর বল্‌বে কেন ? মদ খেলে লোকের এম্নি বুদ্ধিই হয়, বটে !

মণি। তা, আমাকে রাগাচ্ছ কেন ? টাকা ফেলে দিলেই ত আমি চ'লে যাই।

জয়া। না, আজ কিছুতেই তোকে টাকা দোব না। তুই কি কর্ত্তে পারিস্ কর্।

(জয়াবতীর প্রস্থান ও অপর দিক্ হইতে লীলার প্রবেশ।)

লীলা। কা'কে যে কি বুল, তার কিছুই ঠিক্ থাকে না।

মণি। কেন? কা'কে আবার কি বল্লুম!

লীলা। মায়ের কি অম্নি ক'রে বাপ্ তোলে!

মণীন্দ্র। ওঃ!—ভাটপাড়ার পণ্ডিতের কাছে বিধান নিতে ভুলে গেছলুম্!

লীলা। কোথায় যাবে?

মণীন্দ্র। যেখানেই যাই না কেন?

লীলা। তবু বল না, শুনি?

মণীন্দ্র। তোমার কাছে সে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই!

লীলা। আমি কি তোমার কেউ নয়?

মণীন্দ্র। না। কে আবার তুমি?

লীলা। সত্যিই কি আমি তোমার কেউ নই? তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী, তোমার সহধর্ম্মিণী, আমি তোমার পাপ-পুণ্যের ভাগী। আমাকে কেন তুমি বল্‌বে না?

মণীন্দ্র। কেন ব'লব না শুন্‌বে?

লীলা। বল।

মণীন্দ্র। আমি তোমাকে ভাল বাসি না।

লীলা। কেন আমাকে ভালবাস না? কি ক'র্লে আমায় ভাল বাস্‌বে বল, আমি তাই কোর্ব্বো।

মণীন্দ্র। তুমি কালো, তাই ভালবাসি না। সুন্দর হ'তে পার্ব্বে? আমি সুন্দরী চাই।

লীলা। সৌন্দর্য্য বিধাতার দান। বিধাতা তা আমায় দেন্ নি। সৌন্দর্য্য আমি কোথায় পাব? তা'ছাড়া আর কি কর্লে তুমি সন্তুষ্ট হবে বল, আমি তাই কোর্ব্বো।

মণীন্দ্র। গান গাইতে পার্ব্বে? হার-মণিয়ম বাজাতে পার্ব্বে?

লীলা। গান-বাজনা ত' শিখি নি! ছেলেবেলায় কেউ ত তা আমার শেখায় নি। তুমি শেখাও। তুমি শেখালেই শিখ্‌তে পার্ব্বো। মানুষের অসাধ্য কি কাজ আছে? ছেলেবেলা থেকে যা শিখেছি, তাই জানি। গান-বাজনা কেউ ত শেখায় নি!

মণীন্দ্র। তবে আমার মাথামুণ্ডু কি পার্ব্বে? এ পার্ব্বে না, ও পার্ব্বে না, তবে কি পার্ব্বে? কেবল রান্না-ঘরে বসে তেল-কালী মাখ্‌তে পার্ব্বে? কল-তলাতে বসে কাদা ঘাঁট্‌তে পার্ব্বে?

লীলা। আমরা গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে, গৃহস্থ-ঘরের বৌ, গৃহস্থ-ঘরের যা কাজ তাই শিখেছি, তাই জানি। এ ছাড়া যদি কিছু শিখ্‌তে হয়, তুমি শিখিয়ে দাও।

মণীন্দ্র। আমি কেন শেখাতে যাব? আমার কি দায়?

লীলা। তুমি না শেখালে কে শেখাবে? তুমি গুরু, তুমি প্রভু! তুমি না শেখালে কে শেখাবে? স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন পৃথিবীতে আর কেউ নেই। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র গুরু, দেবতা, রক্ষক।

মণীন্দ্র। আর বক্তৃতা কর্ত্তে হবে না, থামো! (পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া) পাঁচটা বাজে, এখুনি তারা ডাক্‌তে আস্‌বে, আমায় যেতে হবে।

(প্রস্থানোদ্যত)

লীলা। কে ডাকতে আসবে?

মণীন্দ্র। সে-কথায় তোমার দরকার কি?

(পুনঃ প্রস্থানোদ্যত)

লীলা। না, না, একটু দাঁড়াও। (মণীন্দ্রের হাত ধরিল) সমস্ত দিনের ভিতর ত বাড়ী

আন না। যদি দয়া করে এসেছ, একটু দাঁড়াও।

মণীন্দ্র। (সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া) আঃ! নোংরা হাত আমার গায়ে দিও না।— জামাটা নোংরা করে দিলে! (জামা দেখিতে লাগিল) জ্বালাতন কোরো না, সর; যাই।

লীলা। কোথায় যাবে? আমি যেতে দেব না। যেতে পাবে না। তুমি যাই বল না কেন, তুমি আমার! আমার ভিন্ন আর কারও নও।

মণীন্দ্র। আচ্ছা, একটা কথা বলি, শুনবে?

লীলা। কেন শুন্‌বো না? তোমার কথা শুনতে পাই না, এই আক্ষেপ! তোমার কাজ কর্ত্তে পালে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে কোর্ব্বো। তোমার আদেশ-পালন কর্ব্বার জন্যে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কি কর্ত্তে হবে বল?

মণীন্দ্র। আমাকে পাঁচ শ' টাকা দিতে পার্ব্বে?

লীলা। টাকা!! টাকা আমি কোথায় পাব?

মণীন্দ্র। এই যে বাবা, এত কেঁদেলি কচ্ছিলে! আর যেই কথাটা বলছি অম্নি পেছুচ্ছ! এটা পার্ব্বে না, ওটা পার্ব্বেনা, তবে আর পার্ব্বে কি আমার মাথামুণ্ডু? আমি জানি, মেয়ে-মানুষ কেবল কথার সর্ব্বস্ব; বিশেষতঃ তোমাদের মতন মেয়েছেলে!

লীলা। আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের ত নিজেদের রোজগারের ক্ষমতা নেই। স্ত্রীলোক স্বামীর টাকায় ধনবতী। আমাকে ত তুমি কোন দিন টাকা দাও নি! তবে আমি টাকা কোথায় পাব?

মণীন্দ্র। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে আর একটা কাজ কর্ত্তে পার্বে?

লীলা। কি বল?

মণীন্দ্র। (চুপি চুপি) কাকার কাছ থেকে লোহার সিন্ধুকের চাবিটা চুরি করে আন্‌তে পার্বে?

লীলা। (শিহরিয়া) চুরি? কি সর্ব্বনাশ! চুরি আমি কর্ত্তে পার্ব্ব না!

মণীন্দ্র। দূর হও আমার কাছ থেকে!

(নেপথ্যে) মণিবাবু! বলি, অ মণিবাবু!—)

মণীন্দ্র। ঐ তারা এসেছে! (প্রস্থানোদ্যত)

লীলা। তোমার পায়ে পড়ি, যেও না! ওদের সঙ্গে মিশো না। চেয়ে দেখ দেখি আর্শি ধরে নিজের চেহারাখানা! কি ছিলে আর কি হয়ে গেছ? আমার মাথা খাও, তোমার পায়ে পড়ি, একটা দিন ঘরে থাক। একদিন আমায় তোমার সেবা কর্ত্তে দাও।

(মণীন্দ্রের পায়ে ধরিল)

(নেপথ্যে) মণিবাবু! আজ বেরুবেন্ না?

মণীন্দ্র। ঐ আবার তারা ডাক্‌ছে! (স্বগত) আঃ! কোথা হতে এ পাপটা জ্বালাতন কর্ত্তে এল? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তোমার গলা থেকে ঐ হার-ছড়াটা দাও দেখি। তা হলে আজ থাকবো এখন।

লীলা। (কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া মণীন্দ্রের হাতে দিয়া) এই নাও। কোন্ তুচ্ছ এ হার! তোমাকে পেলে আমি এ বিশ্বসংসারের কিছুই চাই না।

মণীন্দ্র। (হার গ্রহণ করিয়া) পথ ছাড়, আমায় যেতে হবে।

লীলা। এই বল্লে, যাবে না?

মণীন্দ্র। সে আমার খুসি!

লীলা। না, আজ কিছুতেই যেতে পাবে

না। আমি আজ কিছুতেই তোমাকে ছাড়্‌বো না। (পুনর্ব্বার মণীন্দ্রের পায়ে ধরিল।)

মণীন্দ্র। (বিরক্তি-সহকারে) আঃ! এক্‌ষ-বারি জ্বালাতন ভাল লাগে না। সজোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া মণীন্দ্র চলিয়া গেল; লীলা পড়িয়া গেল। (জয়াবতীর পুনঃ প্রবেশ।)

জয়া। আহা হা! মরে যাই! হতভাগা বাছাকে ফেলে দিয়ে গেল গা? এমন লক্ষ্মী বৌ কি এখনকার দিনে হয়? কপালটা কেটে গেছে বুঝি? (গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন) বৌ-মা! ও বৌ-মা!

(ভোলানাথের প্রবেশ।)

ভোলা। বৌদিদি! তুমি আবার মণেকে টাকা দিয়েছ?

জয়া। না, ভাই, আমি ত তাকে টাকা দিই নি! আমি বলেছি লোহার সিন্ধুকের চাবি তোমার কাছে।

ভোলা। বেশ করেছ! ছোঁড়া আমাকে তবু একটু ভয় করে। কি করে যে ছোঁড়া শোধ্‌রাবে! (লীলাকে দেখিয়া) এ কি! বৌমা, এমন করে পড়ে কেন? কপাল দিয়ে রক্ত পড়্‌ছে যে!

জয়া। মণে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেছে। হারছড়াটা বুঝি নিয়ে গেছে?

ভোলা। ওঃ! এত দূর! আমিও দেখলুম বটে, তার হাতে একছড়া হার রয়েছে; জিজ্ঞাসা ক'লুম, বল্লে,"এ তোমাদের বাড়ীর নয়, আমার এক বন্ধুর!" মনে কলুম, হবেও বা! ওঃ! বড় ঠকিয়ে পালিয়েছে! আচ্ছা, আমিও তাকে জব্দ কোর্ব্বো। এখুনি পুলিশে খবর দিচ্ছি, দাঁড়াও। যেমনকে তেমন! নইলে কিছুতেই শোধরাচ্ছে না।

[ভোলানাথের প্রস্থান।]

লীলা। (উঠিয়া) মা, কাকাকে বারণ করুন, পুলিশে খবর দিতে বারণ করুন্। আমি হার দিয়েছি; তিনি ত নিজে নেন নি! ওমা! শীগ্‌গির যান, কাকাকে বারণ করুন্। পুলিশে নয় ত তাঁকে ধ'রে নিয়ে যাবে। ওমা, কি হবে?

জয়া। তোমার কোনো ভয় নেই মা, তোমার কাকা ভালই ক'চ্ছেন। ওকে একটু শাসন না ক'লে চল্‌ছে না। চল, এখন কাপড় কাচ্‌বে চল, সন্ধ্যে হয়ে এল।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

(হেমচন্দ্রের বাটী—লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির। পূজার উপকরণ হস্তে লইয়া হরিদাসের প্রবেশ; অপর দিক্ দিয়া অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

হরি। বৌ-ঠাকরুন্, এখানে এসেছেন্ এই যে! সর্ব্বেশ্বরবাবু একবার আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে চাইছেন্।

অন্ন। কেন হরিদাস?

হরি। আমাকে সে কথা ত কিছু ব'ল্লেন না। ব'ল্লেন, আপনার কাছে বল্‌বেন্। কোন কাজের কথাই হবে।

অন্ন। কাজের কথা ত বুঝলুম। তা কাজের কথা আমার কাছে কেন? সে ত ওঁকে বল্লেই পার্ত্তেন্।

হরি। আজকাল বাবু যে কোথায় থাকেন্, বাবুর ত দেখাই পাওয়া যায় না। হয় বাড়ীর ভেতর, নয় ত গঙ্গার ধারে ব'সে থাকেন্। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক! তাঁকে কোন কাজের কথা ব'ল্লে উত্তরই পাওয়া যায় না।

অন্ন। (স্বগত) হা—ভগবন্! যত মনে

কলি কাতর হব না, ততই মন ভেঙে পড়ে কেন? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তাঁকে আন্‌তে বল। কি কথা আছে বল্‌তে বল।

হরি। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন; আমি ডেকে দিইগে।

[মন্দির-মধ্যে পূজার দ্রব্যাদি রাখিয়া হরিদাসের প্রস্থান ও সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ।]

অন্ন। আপনি আমাকে কি বল্‌তে চাচ্ছিলেন্?

সর্ব্বে। আজ্ঞে হ্যাঁ, মা! জমীদারী যাওয়া অবধি বাবুর মন এমন হয়েছে, তিনি ত আর কিছুই দেখেন্ না! কোথায় থাকেন্! দরকার হ'লে তাঁকে খুঁজেই পাই না। আমি এত বোঝাই, কিছুতেই তাঁর মন ফেরাতে পার্লুম না। তিনি যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গেছেন। সে-দিন মণিরায়ের একটা লোক রাস্তায় এত অপমান ক'র্লে, বাবু একটা কথাও কইলেন না। মাথা নীচু ক'রে চলে এলেন। আমার এ-সব সহ্য হয় না।

অন্ন। আমি কি কোর্ব্বো? আমাকে কি কর্ত্তে বলেন্?

সর্ব্বে। মা, আপনি বুদ্ধিমতী, সাধ্বী। আপনি চেষ্টা ক'রে যাতে বাবুর মন পরিবর্ত্তন কর্ত্তে পারেন, তা করুন্। আপনি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না! আপনার গহনা বিক্রীর টাকায় বেশ ব্যবসা চল্‌ছিল, কিন্তু বাবুর অমনোযোগে সব নষ্ট হ'য়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। আর থাকে না!

অন্ন। আপনি ত রয়েছেন্, আপনি কেন দেখেন্ না?

সর্ব্বে। মা, সিংহের ভার কি শৃগালে বইতে পারে? বাবুর এই রকম ভাব দেখে লোকজন কেউ আমাকে গ্রাহ্য করে না। মহাজনে মাল ধারে দেয় না! কি বল্‌ব মা, যেখানে আমি প্রবল প্রতাপে কাজ করে এসেছি, সেখানে আমি যেন জুজু হ'য়ে আছি! এই বেলা বাবুর মন ফেরাতে না পার্লে সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ হবে।

অন্ন। ঈশ্বর যা ক'র্বেন তাই হবে। অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নেই। নইলে এমন হবে কেন?

সর্ব্বে। অদৃষ্ট ব'লে চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না, মা! চেষ্টা কর্ত্তে হবে। চেষ্টার অসাধ্য জগতে এমন কি কাজ আছে মা? বাবুর যে রকম মনের অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা'তে আমার ভয় করে।

অন্ন। আমি মেয়ে-মানুষ, আমার উপায় কি? আমি কি কর্ব্বো?

সর্ব্বে। আপনাকে কিছু ক'র্ত্তে হবে না, আপনি কেবল সর্ব্বদা বাবুর কাছে কাছে থাক্‌বেন্, আর তাঁকে বোঝাবেন্। তিনি চির-কাল ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত হয়েছেন, দুঃখ-কষ্টের মুখ কখনও দেখেন্ নি! হঠাৎ একেবারে দারিদ্র্যের কোলে পড়েছেন, সেইজন্যেই মনের এত বিকৃতি ঘটেছে। তাঁকে বুঝিয়ে কাজকর্ম্মের দিকে একটু মন দেওয়াতে পার্লে ই সব সেরে যাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা! আমি অনেক ভাল লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি, সকলেই বল্লেন, একটু চেষ্টা কর্লে ই আমাদের বিষয় আমরা ফেরত পেতে পারি। আমি এজন্যে প্রাণপণ চেষ্টায় আছি। বাবু একটু মনোযোগ দিলেই, অনায়াসে আবার বিষয়টা ঘরে আসে। বড় জোর ও যে-টাকায় কিনেছে, সেই টাকাটা ওকে দিতে হবে।

অন্ন। ওকে এ-কথা বলেছিলেন ?

সর্ব্বে। হ্যাঁ, বলেছিলুম, কিন্তু বাবু বল্লেন, "যা হ'বার হয়ে গেছে, আর আপনার লোককে বিপদে ফেলা কেন ?"

অন্ন। তা ত সত্যি কথা।

সর্ব্বে। বলেন্ কি! যে বিশ্বাসঘাতক এমন সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারে, সে আবার আপনার লোক কি? আত্মীয় ব'লে তার প্রতি আবার মায়া-মমতা কিসের ? আমি এর জন্যে প্রাণপণ করেছি। নিমক-হারাম পাজী বেটাকে আমি একবার দেখে নেব। এর জন্য আমাকে নালিশ, মোকদ্দমা, যা কর্ত্তে হয়, আমি সব ক'র্ব্ব। কিছুতে ছাড়্‌ব না। এমন বদমায়েসকে শাস্তি না দিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ওঃ! বেটার কথা মনে হলে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে। নেমকহারাম ব্যাটা ম্যানেজার হয়েছিলেন, রাজার হালে ছিলেন। শেষে রক্ষককেই ভক্ষণ! বাবু তাই সে-দিন চুপ করে ফিরে এলেন, আমি হলে জুতোর চোটে সেইখানেই ব্যাটার বিষয়-ভোগ করা বার করে দিতুম। আমার বোধ হয়, মণিরায়ও এর ভেতর আছে। সে-দিন যে-ভাবে কথাগুলো কইলে, তাতে স্পষ্টই একথা মনে হ'ল। তা'কেও একবার দেখে নোব।

অন্ন। কেন! মণিরায়ের সঙ্গে ত আমাদের কোনও শত্রুতা নেই! সে কেন এর ভেতর থাক্‌বে ?

সর্ব্বে। শত্রুতা কি বাবুর ভগ্নীপতির সঙ্গেই ছিল, না? হিংসুটে লোকের হিংসেয় সব করে। এ সংসারে লোকে ভালর ভাল কি দেখ্‌তে পারে ? আচ্ছা, আমিও একবার সবাইকে দেখে নোব। তবে এখন আমি যাই মা! বাবুর যাতে মন পরিবর্ত্তন হয়, আপনি সে-বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ক'র্ব্বেন্।

[প্রস্থানোদ্যত]

অন্ন। আর একটা কথা

সর্ব্বে। কি, আজ্ঞা করুন্!

অন্ন। বিষয়-সম্বন্ধে আপনি যা ব'ল্লেন, তা'তে ত অনেক টাকা খরচ হবে। অত টাকা এখন কোথায় ?

সর্ব্বে। সেজন্য আপনি ভাব্‌বেন না; সে ভার আমার। যত টাকা দরকার হবে, আমি যেমন করে পারি, তা সংগ্রহ কর্ব্বো। তারপরে আমাদের চিরকালের পৈতৃক সম্পত্তি একবার হাতে এলে, আর ভাবনা কি? আমি এখন চল্লুম। আপনাকে যা বল্লুম, আপ্‌নি তা কর্ব্বেন্। [প্রস্থান]

অন্ন। (নতজানু হইয়া করযোড়ে) হে প্রভু! বিপদ্‌ভঞ্জন! মধুসূদন! হে অকূলের কাণ্ডারি! কূল দাও নাথ; এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর, প্রভু! তুমি রাজসভায় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ করেছিলে, বালক ধ্রুবকে মোক্ষপদ দিয়েছিলে, প্রহ্লাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলে! হরি, তুমি দয়ার সাগর! তোমার করুণার সীমা নেই। আমি অবলা, তোমার মহিমা কি জানি, ঠাকুর! তুমি ভিন্ন অনাথের যে আর কেউ নেই। দয়াময়! দয়া কর। আমার স্বামীকে প্রকৃতিস্থ রাখ; তাঁর বুদ্ধি-জ্ঞান হরণ কোরো না, তাঁর সুমতি থেকে তাঁকে বঞ্চিত কোরো না। বিপদে পড়ে যেন তাঁর বুদ্ধিলোপ না হয়। ঐশ্বর্য্য গেছে —যাক্! ভাগ্যে থাক্‌লে আবার হবে, কিন্তু আমার স্বামীর দেহ-মনঃ-প্রাণ ভাল থাকে যেন।

[গাহিতে গাহিতে একটী ভিখারীর প্রবেশ।]

(গান)

হৃদয়-দুয়ার খুলে অনিবার
প্রাণ ভরে তাঁরে ডাক দেখি মন!
সে যে অকূল-কাণ্ডারি, ভব-ভয়হারী
তাপিতের তাপ করে নিবারণ!
এ সুখ-সম্পদ, সকলি বিপদ,
চিরদিন এ ত রবে না কখন!

কি ছার আশায়, ফিরিতেছ হায়,
বিষয়ের বিষে হয়ে অচেতন!
জলবিম্ব-প্রায়, মিশে সব যায়,
প্রাণে জাগে শুধু বিষাদ-বেদন।
ঘুচিবে তরাস, মিটিবে পিয়াস,
অভয়-চরণে নাও রে স্মরণ!

(ক্রমশঃ)

"আকাশ পানে চেয়ো"—

দিবস-রাতে মাঝে মাঝে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!
খেলায় কাজে সকাল সাঁঝে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!
মোহ যখন ফেলবে ঘিরে,
বিপদ্ কুটিল চাইবে ফিরে,
আঁধার যখন নাম্‌বে ধীরে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!

সুখের দিনে হাসির মাঝে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো।
বাদ্‌লা দিনের ঝঞ্ঝা-ঝড়ে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!
মৃত্যু যে-দিন আস্‌বে কাছে
দেখ্‌বে আঁধার আগে পাছে,
তবু নীলাকাশে বন্ধু আছে,
তাই আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বারাণসী-ধামে ত্রিলোচনের মন্দির আছে। ইহার তিনটী চক্ষু আছে বলিয়াই ইনি ত্রিলোচন-নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, যখন শিব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, বিষ্ণু তখন তাঁহার পূজার জন্য এক সহস্র বিভিন্ন পুষ্প লইয়া আসিতেন। একদা বিষ্ণু সহস্র পুষ্প লইয়া আসিয়া পূজায় রত হইবেন, এমন সময় তাঁহার মন অন্য স্থানে আকৃষ্ট হইল। শিব সুযোগ বুঝিয়া একটী পুষ্প হরণ করিলেন। এ-দিকে বিষ্ণু একটী পুষ্প কম দেখিয়া বড়ই সংকটে পড়িলেন এবং সংখ্যা পূর্ণ করিবার মানসে স্বীয় চক্ষু উৎপাটিত করিয়া পূজায় দান করিলেন। শিবের কপালে চক্ষুটী রাখিবামাত্র উহা সংলগ্ন হইল। তদবধি তিনি

ত্রিলোচন-নামে খ্যাত হইলেন। অন্য প্রবাদ এই যে, শিব সপ্ত পাতাল পর্য্যটন করিয়া এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। গৌরী শিবের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া পান নাই। শিব তৃতীয় চক্ষু দিয়া গৌরীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। লোকের বিশ্বাস এই যে, এই মন্দিরের তলে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণী-সঙ্গম হইয়াছে। সেইজন্য সরস্বতীশ্বর, যমুনেশ্বর, এবং নির্ব্বুধেশ্বর নামে তিনটী দেবতা এখানে বাস করেন্। মন্দিরের সীমার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুইটী দেবতার মূর্ত্তি দেখা যায়, কিন্তু শেষোক্তটী ত্রিলোচনের মন্দিরের কিছু দূরে অবস্থিত। লোকদিগের বিশ্বাস এই যে, ত্রিলোচন-দেবের পূজা করিলে নরক-যন্ত্রণা ভুগিতে হয় না। বৈশাখ-মাসের কোনও এক রাত্রি ও দিবা যদি কেহ জাগরণ করিয়া ত্রিলোচনের পূজা করে, তাহা হইলে সে মুক্ত হইয়া যায়। মন্দিরটী পুণার নাথুবালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চত্বরে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। ইহার দক্ষিণ দিকে যে-সকল দেব-মূর্ত্তি দেখা যায়, তন্মধ্যে একটীর নাম কোটী-লিঙ্গেশ্বর। চত্বরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটী অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিম্নে হনুমানের মূর্ত্তি বিরাজিত। ইহার সন্নিকটে গণেশ ও শীতলার মূর্ত্তি দেওয়ালে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণে বারনারসী-নামে একটী দেবতা আছেন। ইঁহাকেই রাজা বনারে দান করিয়াছিলেন। গণেশ- ও সূর্য্য-মূর্ত্তি এখানে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিলোচন-দেবের মন্দিরটী আটটী থামের উপর অবস্থিত। ছাদটী আলেখ্য-দ্বারা ভূষিত। সম্মুখে দুইটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। পূজা-সমাপনান্তে ভক্তগণ ঘণ্টাগুলি বাজাইয়া থাকেন্। মন্দিরের দ্বারের বিপরীত ভাগে একটী শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বৃষ-মূর্ত্তি দেখা যায়। মন্দির-সংলগ্নীভূত প্রাচীরে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত গণেশ-মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। বামদিকের দেওয়ালের কুলুঙ্গীতে শিখগুরু নানক-সার মূর্ত্তি স্থাপিত। দক্ষিণ দিকের কুলুঙ্গীতে নারায়ণ এবং লক্ষ্মীর কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি অবস্থিত।

পাপীদিগের যে কিরূপ শাস্তি, তাহার একটি চিত্রও এখানে দেখা যায়। সম্মুখে মৃত্যুরূপী নদী অবস্থিত। জীবগণ ইহা পার হইয়া অপর পারে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। কেহ কেহ বা একলা পড়িয়া নদী-তরঙ্গে বিধ্বস্ত হইতেছে; কেহ কেহ বা গো-পুচ্ছ ধারণ করিয়া বৈতরণী পার হইতেছে। কোনও স্থানে পাপীদিগকে তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করা হইতেছে। কাহাকেও বা লগুড়াঘাতে শাসিত করা হইতেছে। কামুক-কামুকীগণ তপ্ত লৌহে আবদ্ধ হইয়া অনন্ত জ্বলনে জ্বলিতেছে।

এই স্থান ত্যাগ করিয়া ত্রিলোচন-ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলে, দুইটী পথের কোণে একটী সুন্দর মন্দির দৃষ্ট হয়। ইহা কাষ্ঠসাজ-দ্বারা নির্ম্মিত। ত্রিলোচন-মন্দিরের সন্নিকটে অনেক দেবতার স্থান আছে। এখানে একটী দেবীর নাম উমা। কেনেষিৎ উপনিষদে উমার এরূপ বর্ণনা আছে যে, অসুরবিজয়ে ইন্দ্রাগ্নি-পবনাদি দেবতাগণ আত্মার স্বরূপ না জানিয়া অসুরবধে আপনাদিগের ক্ষমতা মানিয়া মহাগর্ব্বী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই অসদভিমানাপনয়ন-হেতু এবং আপ-নার স্বরূপলক্ষণ-বোধন-জন্য দেবাদির সম্মুখে

বিস্মাপনীয়রূপে ব্রহ্ম অবতীর্ণ হন্। ইন্দ্রাদি-দেবগণ কিন্তু ইন্দ্রিয়গোচরে প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই। অনন্তর ব্রহ্মের তিরোধান-সময়ে ইন্দ্রাদি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এ অদ্ভুত পুরুষ কে? যখন অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা পরাভূত হইলেন, তখন ইনি পরমপূজ্য পুরুষ হইবেন, এই অভিধ্যান করিতে লাগিলেন্। এমন সময়ে হৈমবতী উমা-নাম্নী পরা-বিদ্যা প্রাদুর্ভূতা হন্। তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, "মাতঃ! উমে! এই যক্ষপুরুষ কে, যিনি দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইলেন?" তখন সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা উমা কহিলেন, "ইনি ব্রহ্ম। অসুর-সংগ্রামে তোমরা ঈশ্বর-কর্ত্তৃক জয়লাভ করিয়াছ। ঈশ্বরেরই এই বিজয়। তোমরা নিমিত্তমাত্র। ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও কোন ক্ষমতা নাই। তোমরা যে বল, 'আমরা জয় করিয়াছি', সে শুদ্ধ অভিমানের কার্য্য। অতএব মিথ্যাভিমান ত্যাগ কর।" এই উমা-বাক্যে দেবতারা ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। উমাই প্রণবরূপা! উ ম অ এই অক্ষরত্রয়-সম্বলিত হইয়া উমা হইয়াছে।

ত্রিলোচনঘাট পিলপিল-তীর্থ নামে খ্যাত। এখানে গঙ্গা-স্নান করিয়া তীর্থকামিগণ পঞ্চগঙ্গা-ঘাটে গমন করে ও তথায় যাইয়া পুনরায় স্নান করে; পরে মণিকর্ণিকা-কূপে যাইয়া কূপোদকে অবগাহন করে। পিলপিল-ঘাটের অনতিদূরে গাই-ঘাট অবস্থিত।

সন্নিকটে যে দুইটী মন্দির দেখা যায়, তন্মধ্যে একটী নির্বুদেশ্বরের ও অন্যটী আদি মহাদেবের। দুইটী মন্দিরই কারুকার্য্য-হীন। আদি-মহাদেবের মন্দিরে ব্যাস-গদি আছে। ব্রাহ্মণ এই গদিতে উপবিষ্ট হইয়া কথকতা করেন। ঘাটের সম্মুখে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ আছে এবং তথায় যে চত্বর দেখা যায় তদুপরি পার্ব্বতীশ্বরীর প্রস্তরমূর্ত্তি বিরাজমানা। এখানে আরও অনেক দেবতা আছেন। উক্ত অশ্বত্থবৃক্ষের পশ্চাতে গণেশের মন্দির অবস্থিত।

*   *   *

গঙ্গাতটে যে-সকল তীর্থস্থান অবস্থিত, তন্মধ্যে পঞ্চগঙ্গাঘাট একটি। হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, এখানে পাঁচটী নদী সম্মিলিত হইয়াছে; যথা ধূতপাপা, জরনানন্দ, কিরণ-নদী, সরস্বতী এবং গঙ্গা। প্রবাদ এইরূপ যে, ধৌতপাপা-নাম্নী একটী কুমারী ধর্ম্মনামক স্ত্রীয় স্বামীকে উপহাসচ্ছলে শাপ দিয়া ধর্ম্মনদ-নামক নদীতে পরিণত করেন। স্বামীও প্রতিহিংসা লইবার মানসে তাহাকে পর্ব্বতে পরিণত করেন। কুমারীর পিতা বেদাঙ্গির দয়াপরবশ হইয়া কন্যাকে চন্দ্রকান্ত-প্রস্তরে পরিণত করেন্। তৃতীয় স্রোতস্বতী কিরণ-নদী সূর্য্যের ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। সূর্য্যদেব যখন মঙ্গল-গৌরীর আরাধনায় রত থাকেন্, তখন তাঁহার ঘর্ম্ম হইতে থাকে। সেই ঘর্ম্মই কিরণ-নদীর জনক। এখানকার সংলগ্নীভূত ঘাটে মঙ্গলগৌরীর মূর্ত্তি আছে। উক্ত তিনটী ও গঙ্গা এবং সরস্বতী একত্রে পঞ্চনদরূপে বিখ্যাত। কেবলমাত্র গঙ্গাই চক্ষের গোচরীভূত ও অন্যগুলি দৃষ্টির বহির্ভূত।

পঞ্চগঙ্গা ঘাটের সিঁড়ি চড়িয়া লক্ষ্মণবালা-ঘাটে যাইতে পারা যায়। এখানে লক্ষ্মণবালা-নামে একটি মন্দির আছে। দেওয়ালগুলি ছবি-দ্বারা পরিশোভিত। ছবির মধ্যে যুদ্ধের

ছবিই অধিক। অন্যান্য ছবি নাই, এ-কথা বলিতে পারা যায় না। এই ছবিগুলির মধ্যে দশ-মহাবিদ্যারও ছবি আছে। হিন্দুরা ব্রহ্মকে যেমন পুরুষ মানেন, তেমনই স্ত্রীও মানেন। তিনি বালকও বটেন্ এবং যুবাও বটেন। তাই শ্রুতিতে আছে—পুমাং ত্বং স্ত্রী ত্বং উতত্বং বালো যুবা বৃদ্ধস্ত্বং দণ্ডো দণ্ডেন জীর্য্যতি। এই দশমহাবিদ্যা বিষ্ণুর দশাবতারের রূপান্তর-মাত্র। যথা :—

কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাৎ বরাহশ্চৈব তারিণী।
সুন্দরী জামদগ্ন্যস্তু বামনো ভুবনেশ্বরী।
ছিন্নমস্তা নৃসিংহস্তু বলভদ্রস্তু ভৈরবী।
কূর্ম্মো বগলাদেবী মীনো ধূমাবতী তথা।
বুদ্ধোমতঙ্গী বিজ্ঞেয়া কল্কিস্তু কমলাত্মিকা।
এতে দশাবতারাস্তু দশ বিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালিকা। এই কৃষ্ণ-নামোল্লেখে রামমূর্ত্তি। বরাহরূপ তারা, ষোড়শী পরশুরাম। ভুবনেশ্বরী বামনরূপ। বলরাম-মূর্ত্তি ভৈরবী। ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, কূর্ম্মরূপ বগলা, ধূমাবতী মীন, বুদ্ধরূপ মাতঙ্গী, এবং কল্কিরূপ কমলাত্মিকা। এই দশাবতার দশ মহাবিদ্যা বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

উক্ত লক্ষণবালা-মন্দিরে, তীর্থকামিগণ মালা জপ করেন। এখানে গান-বাজনাও হইয়া থাকে। যেখানে বাদকগণ উপবেশন করে, তাহার কোণে তিনটী মূর্ত্তি আছে। মধ্যে যে মূর্ত্তি অবস্থিত, তাঁহার পরিধানে নীল বসন, মস্তকে নীল পাগড়ী ও গলায় ফুলহার। ইহার বামদিকে একটি গিল্‌টি করা চক্র দেওয়ালে গাঁথা আছে। তাহাতে নাক, চক্ষু, গাল, মুখ এবং জ্যোতির্ম্মণ্ডল দৃষ্ট হয়। ইহাই সূর্য্য-দেবের মূর্ত্তি। ইহার দক্ষিণ দিকে চন্দ্রের মূর্ত্তি। ইহাদিগের সামান্য দূরে একটি দীপ জ্বলিতে থাকে।

পঞ্চগঙ্গাঘাটের সিঁড়ি চড়িয়া ঔরঙ্গজেব-নির্ম্মিত মস্‌জিদে যাওয়া যায়। ইহাই 'মধুদাসকা দেওড়া' নামে খ্যাত। মসজিদটী খুবই পাকা।—দেখিলেই বোধ হয় যেন নূতন তৈয়ার হইয়াছে। কত শতাব্দী এই মস্‌জিদের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহা নবীনত্ব হারায় নাই। মস্‌জিদটীতে কেবলমাত্র শুক্রবারে লোকজন সমবেত হইয়া নমাজ পড়ে। ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ইহারই আয়ে মস্‌জিদের খরচার সরবরাহ চলিয়া থাকে। একজন মুল্লা এই মস্‌জিদের মালিক।

বারাণসী-ধামের উত্তর দিকে কামেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইহাই পুরাতন মন্দির। ইহা খুব যে পুরাতন, তাহা নহে; তবে আধুনিকও নহে। এখানে অনেক দেবতাই আছেন। চতুরস্রের মন্দিরগুলি লাল রঙ্গে রঞ্জিত। এখানকার প্রধান মন্দিরটি কামনাথ বা কামেশ্বরের। ইনিই কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। অন্য মন্দিরে রাম সীতা, লক্ষ্মী এবং সূর্য্যের মূর্ত্তি আছে। এখানে ১০।১২টি মন্দির অবস্থিত।

ইহার উত্তর দিকে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ-তলে অনেকগুলি দেবতা আছেন। তন্মধ্যে একটি নরসিংহ-মূর্ত্তি। হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য একটি স্তম্ভ হইতে ইনি নরসিংহাকারে আবির্ভূত হন্। ইহার ক্রোড়ে হিরণ্যকশিপু অবস্থিত। এখানে মৎস্যোদরীর মূর্ত্তিও দেখা যায়। ইনি ময়ূরাসনা। এখানে দুর্ব্বাসা ঋষিরও মূর্ত্তি অবস্থিত।

কামনানাথের মন্দির-সংলগ্ন একটী ঝিল (পুষ্করিণী) ছিল। তাহা মৎস্যোদরী-তীর্থ-নামে আখ্যাত হইত। পুষ্করিণীটী এখন বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। সুতরাং, কামনা-নাথের মন্দিরে তীর্থকামীদিগের ভীড়ও কমিয়া গিয়াছে।

অওসানাগঞ্জ মহল্লার ঈশ্বরনাদী শড়কে যজ্ঞেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইনি শিবলিঙ্গ। মন্দিরটীতে বারাণসীর মহারাজ হইতে দীন-হীন ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই আসিয়া থাকেন। মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে একটী ষাঁড় উপবিষ্ট দেখা যায়। ষাঁড়টী নন্দী-নামে খ্যাত। বিগ্রহটী কৃষ্ণপ্রস্তরের। উচ্চতায় ইহা ৬ ফিট এবং ব্যাসে ১২ ফিট। প্রবাদ এইরূপ যে, যখন দেবগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে শিব প্রস্তরাকারে আবির্ভূত হন। ইহার উপরে একটি সরা অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে ইহাকে ঝাড়া দেওয়া হয়।

অওসানগঞ্জ-মহল্লার লাগাও কাশীপুর মহল্লা অবস্থিত। এখানে দুইটী ঘরবিশিষ্ট একটী মন্দির আছে। একটী ঘরের কুলুঙ্গিতে কাশীদেবী অবস্থিত। তীর্থকামিগণ অন্যান্য মন্দির দেখিয়া এখানে একবার আসিবেই আসিবে। এখান হইতে কিছু দূরেই ঘণ্টাকর্ণ-তালাও নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ঘণ্টাকর্ণ নামে এক পিশাচ ছিল, তাঁহারই নামে এই পুষ্করিণীর নামকরণ হইয়াছে।

কতকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নিম্নে অবতরণ করিলে একটী চতুরস্রে যাওয়া যায়। জলে অবতরণ করিতে হইলে সিঁড়িই সম্বল। চতুরস্রের দক্ষিণদিকে তিনটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে মধ্যস্থিত মন্দিরটী ব্যাসদেবের। ইহা ব্যাসেশ্বর-নামে খ্যাত। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে বেদব্যাস উপবিষ্ট আছেন। ইহার গলে ফুলহার। রামনগরে বেনারসের মহারাজও ইহার নামে একটি মন্দির স্থাপনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা শিবের সহিত সম্বন্ধীভূত বলিয়া ব্যাসের পূজা শিব-পূজাতেই সম্পন্ন হয়। কর্ণঘণ্টা-তালাওয়ে সেটী হয় না। এখানে ব্যাসের স্বীয় মূর্ত্তি আছে। শ্রাবণ-মাসে হিন্দুগণ, বিশেষতঃ রমণীগণ, এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া অশ্বত্থ, কদম্ব ও বটবৃক্ষের পূজা করেন্।

আমরা এখানে বেদব্যাস-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। যাঁহার অসামান্য প্রতিভা-বলে হিন্দুজাতি অদ্য জগৎপূজ্য আসন গ্রহণ করিয়াছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে ত্রুটি রহিয়া যাইবে। বেদব্যাসের আখ্যায়িকা এইরূপঃ—দাসকন্যা সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্র জন্মে। চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধে যক্ষ-হস্তে হত হন। বিচিত্রবীর্য্য অত্যন্ত-রমণাসক্তি-প্রযুক্ত যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া অল্পকালেই মৃত হইয়াছিলেন। উক্ত দাসকন্যা সত্য-বতীর অনূঢ়া-কালে মহামুনি পরাশর-কর্ত্তৃক দ্বৈপায়নের উৎপত্তি হয়। ইনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান্ ও অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। লোকে ইঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার মনে করিতেন্। বদরিকাশ্রমে বাস করাতে ইহার অপর এক নাম বাদরায়ণ। ইনি বেদকে চারি খণ্ডে বিভাগ করাতে "বেদব্যাস"-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ যজুর্বেদ ও সামবেদ হইতে বর্গ-বিভাগক্রমে মন্ত্ররাশি উদ্ধৃত করিয়া ইনি চারি সংহিতা করেন্। পরে বেদব্যাস আপনার চারি

শিষ্যকে আত্মসমীপে আহ্বান করিয়া সেই সকল বেদ-সংহিতার এক এক সংহিতা এক এক শিষ্যকে প্রদান করেন্। তিনি স্বশিষ্য পৈল-ঋষিকে ঋগ্‌বেদ-সংহিতা বলেন, আর বৈশম্পায়ন-নামক শিষ্যকে যজুর্ব্বেদ বলেন; জৈমিনিকে সামবেদ ও ছন্দোগ-সংহিতা বলেন এবং আঙ্গিরসীশ্রুতি-সমন্বিত অথর্ব্ববেদ সুমন্ত-নামক শিষ্যকে বলেন।

ব্যাস-শিষ্য পৈলাদি ঋষিগণের দ্বারা ঐ বেদ-চতুষ্টয় চারিভাগে পুনর্বিভক্ত হয়। যথা মন্ত্র, যজ্ঞ, উদ্গাত্র ও স্তোম। মন্ত্রময় ঋগ্বেদ, যজ্ঞময় যজুর্ব্বেদ, উদ্গাত্র সাম এবং স্তোম অথর্ব্ববেদ। এই চারিভাগের প্রণেতা পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত্র। ইহাদিগের শিষ্য-প্রশিষ্য-দ্বারা অনন্ত শাখায় বেদ বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম, ঋগ্বেদ-শাখা— ইন্দ্রপ্রমতি, বাস্কল, আশ্বলায়ন, অগ্নিমিত্র, মাণ্ডুকেয়, মণ্ডু, মাণ্ডুক্য, সৌভরি, সাকল্য, যাজ্ঞবল্ক্য, বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয় গোখল, ও শিশির। অপর, জাতুকর্ণ। ঐ জাতুকর্ণ সমগ্র বেদের প্রথম নিরুক্তকার হন। পরে তাঁহার শিষ্য যাস্ক, শাকপুণি, উর্ণনাভ প্রভৃতি অনেক ভাষ্যকার হইয়াছিলেন। বলাক, পৈল, জাবাল, বিরজ, বাস্কলি, বালিখিল্য কাশরি, মণ্ডল ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় প্রভৃতি তিনশত পঞ্চাশৎ শাখায় ঋগ্‌বেদ বিভক্ত হয়।

যজুর্ব্বেদের প্রণেতা বৈশম্পায়ন। ইহার শিষ্যপ্রশিষ্য-দ্বারা যজুর্ব্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত হয়; যথা শুক্ল-যজুঃ ও কৃষ্ণ-যজুঃ। ইহার শাখা—তৈত্তিরীয়, বাজসনেয়, কঠ, কাঠক, হিরণ্যকেশীয়, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, শ্বেতাশ্বতর, কালাগ্নিরুদ্র, গায়ত্রী প্রভৃতি একশত পঞ্চদশ।

সামবেদ-প্রণেতা জৈমিনি, তাঁহার পুত্র কৌথুম, ও ইন্দ্রপ্রমিতি। ইহাদিগের প্রণীত এই দুই শাখা। এগুলিও শিষ্যপ্রশিষ্যদ্বারা অনেক শাখায় বিভক্ত হয়। হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, পৌষ্পঞ্জি—এই তিন শাখা আবন্ত্য ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করে। ঐ পৌষ্পঞ্জি ও আবন্ত্য ব্রাহ্মণদিগের শিষ্যানুশিষ্যের চতুর্ব্বিংশতি শাখা। তন্মধ্যে হিরণ্যনাভাদিও কেনেষিত্তাদি শত শত লোক, অর্থাৎ লোকাক্ষি, লাঙ্গল, কুল্য, কুলিশ, কুক্ষি, শাখা বিভক্ত করেন।

অথর্ব্ববেদ-প্রণেতা সুমন্ত্র তৎকৃত অথর্ব্ব-বেদ দুই ভাগে বিভক্ত করেন; যথা শান্তিকল্প, ও নক্ষত্রকল্প। শান্তিকল্পে ষট্‌কর্ম্মলক্ষণ, নক্ষত্র-কল্পে জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিচার। তাহাতে ভূগোল ও খগোল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের উপদেশ আছে। রাজনীতিক, বৈষয়িক কর্ম্মের উপদেশ, পদার্থতত্ত্ব, শিল্পকার্য্য, বাণিজ্য প্রভৃতি অনেকানেক সাংসারিক বিষয়ে উপদেশও আছে। তদ্ব্যতীত পারমার্থিক বিষয়েরও অনেক প্রকার উপদেশের জন্য তৎশিষ্যানুশিষ্যেরা শাখা। ভেদ করেন; যথা প্রশ্ন, নারায়ণ, মহ, বানস্পত্য কৌশিতকী, শতপথ, গোপথ, অথর্ব্বশিখ, অথর্ব্বশিখরা, গর্ভ ক্ষুরিক, আত্মবোধ, কৈবল্যাদি এবং শৌণ্ডায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ পিপ্পলায়ন, বেদদর্শক, কুমুদ, শুনক, জাজলি, বভ্রু, আঙ্গিরস, সৈন্ধবায়ন, সাবর্ণি প্রভৃতি কৃত বেদশাখা পঞ্চশত ভাগে বিভক্ত হয়। কেবল কশ্যপমুনি নক্ষত্রকল্প, আঙ্গিরাসাদিরা শান্তি-কল্পীয় বেদাচার্য্য হন।

অপর এই চারিবেদের মুখ্য শাখাকে উপবেদ বলিয়া ধৃত করিলেন যথা ঋগ্বেদের

অন্তর হইতে আয়ুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদের অন্তর হইতে ধনুর্ব্বেদ, সামবেদের অন্তর হইতে গান্ধর্ব্ববেদ, এবং অথর্ব্ববেদের অন্তর হইতে জ্যোতির্ব্বেদ ও শিল্পোপদেশ বাহির হইয়াছে।

বেদাঙ্গ-শাস্ত্রও বেদ হইতে নির্গত হয়। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ বেদের ছয়টী অঙ্গ। বেদান্ত-শাস্ত্রও বেদাঙ্গত্বে ধৃত ; যথা উপনিষৎ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ-সমষ্টি ও ব্রহ্ম-প্রশংসা।

অপর ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্গত পুরাণ, কাব্য ও ইতিহাস। এই সকল বৈদিক প্রস্তাবকে পঞ্চম বেদ বলে। অল্পবুদ্ধি জনের বেদার্থ-বোধের নিমিত্ত ভগবান্ বাদরায়ণ বিভাগানুক্রমে শ্লোক করিয়া ইতিহাস-পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন। ইহার গ্রাহক ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, হারীত ইত্যাদি। এই কয়েক জনের মধ্যে কাব্য-গ্রাহক বাল্মীকি, ইতিহাস-গ্রাহক বৈশম্পায়ন।

পুরাতন-কথাপ্রসঙ্গকে পুরাণ কহে। পুরাণের লক্ষণ ষট্‌সংবাদ। ইতিহাস কাব্যের এক সংবাদমাত্র। পঞ্চলক্ষণ ও দশ-লক্ষণাক্রান্ত মহাস্বাখ্যায় পুরাণ দ্বিবিধ অর্থাৎ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, বৃত্তি, রক্ষা, মন্বাদিরাজবংশ ও বংশানুচরিত-উপপুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ।

মহাপুরাণের লক্ষণ :—সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, সংস্থা, পোষণ, উচিত, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, ভগবৎ-প্রসঙ্গ, মুক্তি ও আশ্রয় ইত্যাদি। সৃষ্টির লক্ষণ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—অব্যাকৃত পরমাত্মা হইতে প্রথমতঃ মহতত্ত্ব ও অহংতত্ত্বাদি সূক্ষ্মরূপ মহাভূতাদির বৃত্তির, স্বক্ষেন্দ্রিয় বৃত্তির উৎপত্তি হয়। ইহার নাম সৃষ্টি (১)। তাহা হইতে স্থূল-ভূতাদির যে উৎপত্তি হয়, তাহাকে বিসর্গ বলে। যেমন আদিবীজ হইতে পুনঃ বীজোৎপত্তি হয়, তদ্বৎ ঈশ্বরানুগৃহীত মহদাদির পূর্ব্বকর্ম্ম বাসনার প্রধানরূপ সমাহার অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যরূপ চরাচর প্রাণিমাত্রের উৎপত্তিকে প্রতিসৃষ্টি বলে (২)। অপর উৎপন্ন জীবের বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা-নির্দ্দেশ-করণকে বৃত্তি বলিয়া বেদে উক্ত করিয়াছেন ; (৩)। দেব, তির্য্যক ও নরাদিরূপে অবতার হইয়া ভগবান্ এই বিশ্বের শান্তিবিধান করেন, সেই শান্তিবিধানের নাম রক্ষা (৪)। স্বায়ম্ভুবাদি অতীত ষট্‌মন্বন্তর ও বর্ত্তমান বৈবস্বৎ এবং অনাগত সপ্ত, এই চতুর্দ্দশ কাল বর্ণনার নাম মন্বন্তর (৫)। অনন্তর তদ্বৎ মন্বাদির ক্রমান্বয়ে বংশ-বিস্তার-কথনকে বংশ বলে (৬)। এতদর্থে ঈশ্বরানুচরিত-বর্ণন করার নাম বংশানুচরিত (৭)। এই বিশ্বের চতুর্ব্বিধপ্রলয়কে অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক ও মহাপ্রলয়াদি চারি প্রকার প্রলয়কে নিধো বলে (৮)। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও স্বারূপ্যাদি চতুষ্টয়াদিকে মুক্তি বলে (৯)। নিরতিশয় পরমাত্মাতে সমাশ্রিত হইয়া সর্ব্বসংসার-বন্ধের পরিমোচন এবং ব্রহ্মভূত জীবের পরব্রহ্মে লয়াবস্থার নাম আশ্রয়।

অনন্তর মহাপুরাণ ও উপপুরাণের সংজ্ঞা-ভেদে নাম হইয়াছে। ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদীয়, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম্ম ও ব্রহ্মাণ্ড, এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ।

উপপুরাণের সংজ্ঞা যথা—আদি, বৃহন্নারদ,

ধর্ম্ম, কালিকা, নৃসিংহ, নারদীয়, নন্দিকেশ্বর, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, কল্কি, দেবী, মহাভাগবত, আশ্চর্য্য, বৃহৎকূর্ম্ম, বৃহন্নৃসিংহ, বিশ্ব, পরাশর, বৃহৎশিব, বৃহল্লিঙ্গ ইত্যাদি অষ্টাদশ উপপুরাণ। ইতিহাস মহাভারত। আদ্য বাল্মীকির রামায়ণ। ইহার গ্রাহক ভরদ্বাজ ঋষি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বেদব্যাস ছিলেন বলিয়া ও তাঁহার শিষ্যকৃত পুস্তকাদি আছে বলিয়াই ভারত আজি সভ্য-সমাজে গণ্য; নতুবা আজ ভারতবাসীর গণনা অসভ্য দিগের সহিত হইত। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আকাঙ্ক্ষা।

স্বর্ণপাটী ওই ক্ষুদ্র বলে মিশ্‌তে ছুটে অতল জলে,
গন্ধবিহীন ফুলটী সেও ফুট্‌তে যে চায় গোলাপ-দলে!
ক্ষুদ্র কুমুদ যশের তরে ধায় গো চাঁদের কিরণ আশে,
বল্লরীও বৃহৎ হ'তে বৃক্ষে জড়ায় বাহুর পাশে!
ক্ষুদ্র ছুটে মহৎ হ'তে, মহৎ আরও উচ্চে ধায়,
উচ্চ হ'তে উচ্চে শেষে মিশ্‌তে তাঁরই চরণ-ছায়!
সব যে হেথা আপনহারা, যশের আশে অন্ধ যে,
ক্ষুদ্র হ'তে চায় না যে কেউ, সবাই সমান স্বাধীন যে!
মহৎ হ'তে মহৎ যে জন, দীনের হ'তে দীন যে সেই,
ক্ষুদ্র সবাই বৃহৎ হ'লে, গরব যে তা'র কোথাও নেই!

"কেন"—

জীবন আমার শূন্য এমন
মরুর মতন কেন?
—তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
ফুল ফোটে না, ফল ধরে না,
গজায় নাকো শাখা,—
তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
কেন পরাণ-পাখী আমার গাহে না গো গান?
নিঃশ্বসিয়া সদাই যেন তোলে বিলাপ-তান!
ধরণীর এই ছন্দে কেন বাজে না মোর প্রাণ!
তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
হৃদয়-আকাশ সদাই যেন বিষাদ-মেঘে ঢাকা,
পৌর্ণমাসী রাতে তবু ফোটে না চাঁদ বাঁকা!
কেন সকল গীতি আমার নয়নজলে মাখা!
তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
তোমায় যে-দিন পাব বুকের মাঝারে
হাহাকার মোর মিল্‌বে গীতি-ঝঙ্কারে
কাঁপ্‌বে আমার দেহ-বীণা, সুর পাবে না তারে,
ভেসে যাব প্রেমের অকূল পাথারে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

ক্ষীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শৃঙ্গভঙ্গ।—পশুরা গুতাগুতি করিয়া প্রায়ই শিং ভাঙ্গে। শিংয়ের অভ্যন্তর ভাগ নষ্ট না হইলে, তাহার প্রতিকার হইতে পারে। শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড হইয়া যাইলেও অনেক সময় নূতন শিং উঠিতে দেখা গিয়াছে। শিং ভাঙ্গিলেই বন্ধন করা অতিশয় কর্ত্তব্য। একখানা কাপড় শৃঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে ঢিলা করিয়া বন্ধন-পূর্ব্বক নিম-তৈল-দ্বারা তাহা আর্দ্র করিয়া দিবে।

জ্বর।—প্রসবান্তর কখনও কখনও গাভীদিগের অত্যন্ত জ্বর হয়। অভ্যন্তরে বস্তুনিচয় পচিয়া যাইলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এরূপ স্থলে প্রসবের একসপ্তাহের মধ্যে জরায়ুর স্ফীতি হইয়া থাকে। রোগের বৃদ্ধির সহিত শারীরিক উত্তাপের হ্রাস হয়, ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে থাকে এবং গাভীর পশ্চাদ্দিকের পদ খঞ্জ হইয়া যায়। পৃষ্ঠে ভর দিলে গাভী বক্র হইয়া পড়ে। রোগটী ভয়ানক স্পর্শাক্রামক। গাভী অপেক্ষা মহিষদিগেরই এই রোগ অধিক হয়। এ রোগের ঔষধ-ব্যবস্থা করিতে হইলে, নিঃসৃত পদার্থগুলিকে ঔষধ দ্বারা দোষশূন্য করিবে। কার্বলিক এসিড জলে মিশ্রিত করিয়া পিচকারী করিতে হইবে। যে-সকল ক্ষতে ঔষধ লাগাইবার সুবিধা আছে তাহাতে গ্লিসিরিণ এবং কার্ব্বলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে। পথ্য মণ্ড, কিন্তু তাহাও হালকা হওয়া চাই। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এরূপ আহার দিবে।

চক্ষে বাহ্য বস্তুর পতন।—চরিবার সময় পশুদিগের চক্ষে অনেক বস্তু পতিত হয়, অথবা চক্ষে আঘাত লাগিয়া চক্ষুপ্রদাহের সৃষ্টি হয়। চক্ষু উঠিলে চক্ষুর পাতা স্থুল হওয়ায় চক্ষু বুজিয়া যায়, তাহা হইতে জল কাটিতে থাকে এবং আলোক সহ্য হয় না। এরূপ স্থলে চক্ষে ফোমেণ্ট দিবে এবং sub-acetate of lead (সফেদা) দ্বারা চক্ষু ধৌত করিয়া দিবে। চক্ষে যাহাতে আলোক না লাগিতে পারে, তাহা করা কর্ত্তব্য। চক্ষু অল্প পরিমাণে আক্রান্ত হইলে, জলে লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই জলদ্বারা চক্ষু ধৌত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে; অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইলে Calomel দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

রক্তপ্রস্রাব।—রক্তপ্রস্রাব হইলে কোমরে শীতল জলের পটি দিবে এবং sulphuric acid দ্বারা রক্ত রোধ করিবে। সামান্য সামান্য পরিমাণে গ্লিসিরিণ অথবা মসিনার তৈল খাইতে দিবে। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এরূপ পথ্য দেওয়া উচিত।

শূলবেদনা।—গাভী অপেক্ষা ষাঁড়ের শূলবেদনা অধিক হয়। বেদনা উঠিলে ষাঁড়টী পদ-দ্বারা পেট পিটিতে থাকে, কখনও উত্থান কখনও উপবেশন করে, অত্যন্ত চঞ্চল হয় এবং ঘন ঘন প্রস্রাব করিতে থাকে। হঠাৎ আহারের পরিবর্ত্তন, আহারের পর শীতল জল-পান, অতিভোজন অথবা পচা জাব ভক্ষণ ইত্যাদি শূলবেদনার কারণ। এই রোগে এক বোতল দেশী মদ্য পশুটীকে খাওয়াইলে এবং তেজস্কর জুলাপ দিলে বেদনার উপশম হয়।

উদরাময়।—উদরাময়ে পশুগুলির জলের ন্যায় দাস্ত হয়। এই সময়ে তাহারা অল্পাহারী হয় অথবা তাহাদিগের ক্ষুধা আদৌ থাকে না। তাহারা জাবরও কাটে না। চরাই খারাপ হইলে, রেড়ির পাতা খাইলে অথবা সহসা আহারের পরিবর্ত্তন করিলে এই রোগ জন্মে। মহিষশিশুর পেটে পোকা হইলে উদরাময়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই রোগে দাস্তকর আহার, সামান্য জল, কটিলা এবং যবের ছাতু দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে উপকার দর্শে। অথবা খড়ি ১ আউন্স (অর্দ্ধছটাক), খয়ের এক আউন্স (অর্দ্ধছটাক), অহিফেন ৪ ড্রাম (১৬ মাসা) এবং গঁদ ১ আউন্স (অর্দ্ধছটাক) একত্র করিয়া যবের ছাতুর সহিত মিশ্রিত-করণান্তর গুলি পাকাইয়া খাওয়াইবে।

আমাশয়।—আমাশয়-রোগে পশুদিগের অন্ত্রের ঝিল্লী ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে ক্ষত হয়। পশু দণ্ডায়মান হইয়া গা মোচড়াইতে থাকে, পিঠ কোঁজা করে, তাহার জলের ন্যায় পেট নামায় এবং তাহার সহিত সামান্য রক্ত মিশ্রিত থাকে। এইকালে গাভীর শুশ্রূষা উত্তম হওয়া চাই। মসিনার কাথ, যবের ছাতু এবং কালমরিচ চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ-করণান্তর খাইতে দিবে। দুগ্ধের সহিত ভৃষ্ট যবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়াই বিধি।

অজীর্ণ।—সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, গাভীকে উত্তমরূপে আহার দিলেও তাহার শারীরিক উন্নতি হইতেছে না। তখন বুঝিতে হইবে যে, গাভীর অজীর্ণ হইয়াছে। বিশৃঙ্খল-ভাবে আহার-দান, অনুত্তম আহার, ব্যায়ামের অভাব, শৈত্য, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কারণে অজীর্ণের উদ্ভব হয়। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে জুলাব দেওয়া আবশ্যক। এই সময় বেশী মদ্য খাইতে দেওয়াই বিধি, এবং আহারেরও পরিবর্ত্তন চাই। গুড় এবং সিদ্ধি আটার (মোটা ময়দার) গুলির সহিত মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহে একবার গাভীকে খাইতে দিবে এবং গাভীর মুখে সপ্তাহে একবার লবণ ঘর্ষণ করিয়া দিবে।

বিষচিকিৎসা।—অনেক সময় মুচিরা চর্ম্মের লোভে অথবা পুরাতন গোয়ালারা ঈর্ষা-পরবশ হইয়া গাভীকে বিষ দেয়। কেহ কেহ গাভীর গাত্রের কোন স্থানে ক্ষত করিয়া বিষ প্রয়োগ করে। গাভী বিষাক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিলে, গমের ছাতুতে ডিম্বের শ্বেতসার মিশ্রিত করিয়া, গুলি পাকাইয়া খাইতে দিবে এবং বমনকারক ঔষধ দিবে। এই সময় তেজস্বী জুলাপ দেওয়াই বিধি। জুলাপের ঔষধ, দেড় সের ঘৃত অথবা দুই পাউণ্ড (১৬ ছটাক) Epsom salt। এই ঔষধটী পূর্ণবয়স্ক গাভীকে দেয়; পরন্তু পূর্ব্বোক্তটীই উত্তম জানিবে।

অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, গাভী অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে, পেটে পদাঘাত করিতেছে, ঘন ঘন উঠিতেছে ও বসিতেছে, জাবর কাটিতেছে না, আহারেও বীতস্পৃহ রহিয়াছে, পিঠ কোঁকড়াইয়া আছে, উদর স্ফীত হইয়াছে, মুখ হইতে লালাস্রাব হইতেছে, চক্ষু ফুলিয়াছে ও একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, অন্যান্য স্থান অপেক্ষা দক্ষিণপার্শ্বটী অধিক স্ফীত হইয়াছে এবং তদুপরি অঙ্গুলি-দ্বারা আঘাত করিলে ঢপ্ ঢপ্ শব্দ হইতেছে। গাভী অপেক্ষা মহিষেরই এইরূপ রোগ অধিক

দেখা যায়। ঔষধ-ব্যবস্থা না করিলে পশুগুলি যন্ত্রণায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এরূপ রোগে তৎক্ষণাৎ এক বা দুই বোতল দেশী মদ্য এক আউন্স (অর্দ্ধ ছটাক) লঙ্কার সহিত খাইতে দিবে এবং জুলাপ দিবে।

সময়ে সময়ে বাছুরদিগের রোগের বিশেষত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদিগের মুখে ক্ষত হয়, ওষ্ঠ ফুলিয়া উঠে, মুখ দিয়া লালাস্রাব হইয়া থাকে, তাহারা মাতৃদুগ্ধ পান করিতে চাহে না এবং তাহাদের ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে থাকে। এরূপ ঘটিলে মুখটাকে ফট্‌কিরির জল-দ্বারা ধৌত করিয়া সামান্য পরিমাণে sulphuric acid এবং ঘৃত অথবা ৪ আউন্স (দুই ছটাক) Epsom salt দাস্ত হইবার জন্য খাইতে দিবে।

অন্ত্রে পোকা হওয়া।—অনেক সময় বাছুরদিগের দুগ্ধ-পরিপাক হয় না। উদরে যাইয়া তাহা উত্তেজনার উদ্ভব করে। মহিষ-শিশু গুলিরই প্রায় এই রোগটী ঘটিয়া থাকে। রোগটীর প্রথম লক্ষণ কোষ্ঠকাঠিন্য ও তদনন্তর ভয়ানক দাস্ত হইয়া থাকে। শীঘ্র ইহার প্রতিকার না করিলে শিশুগুলি মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এরূপ রোগে তেল বা ঘি ৮ আউন্স (চারি ছটাক) খাওয়াইয়া দাস্ত করাইবে। মসিনার ক্বাথের সহিত সামান্য পরিমাণে লঙ্কা ও ভৃষ্ট যবচূর্ণ (যবের ছাতু) মিশ্রিত করিয়া আহার করাইবে। এই রোগে অনেক ঔষধিই চেষ্টা করা গিয়াছে, কিন্তু নিমপাতা বাটিয়া তাহা লবণ-সংযুক্ত-করণান্তর তাহাতে নিমতৈল মিশ্রিত করিয়া মাতৃদুগ্ধ-পান-কালে দুই বা এক সেকেণ্ড পরেই মুখ টানিয়া লইয়া খাওয়াইয়া দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। পোকাগুলি প্রথম দুগ্ধ-পানমাত্রেই দুগ্ধের স্বাদে অগ্রসর হইয়া আইসে। এমন সময়ে ঔষধ পড়িলেই তাহার পরদিন পর্য্যন্ত অনেক পোকা বাহির হইয়া যায়। পোকা হইলে বাছুরেরা বর্দ্ধিত হয় না।

ক্ষুরারোগ :—অনেক সময় গাভীদিগের এই রোগ হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ এই :—শরীরের উত্তাপের আধিক্য, আহারে বীত-স্পৃহতা, জাবর না কাটা, মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়া, ওষ্ঠদ্বয় এত জোরে লাগিয়া যায় যে কোন মতেই খুলে না, পশুটী কাঁপিতে থাকে, প্রায়ই দাঁত কড়্‌মড়্‌ করিতে থাকে, কোষ্ঠ-কাঠিন্য সঙ্ঘটিত হয়, শ্বাস দুর্গন্ধময় হয়, দুই দিন পরে শরীরে ফুস্কুড়ি নির্গত হয়, মুখ দিয়া লালাস্রাব হইতে থাকে, দানাগুলি বড় হয় কিন্তু স্তন বা বাঁটে তাহা কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পায়ে ঘা হইবার পূর্ব্বে পশুটী যন্ত্রণায় অস্থির হয়, এবং সর্ব্বদা পা ছুড়িতে থাকে। পায়ে ঘা হইলে মক্ষিকা পায়ে বসে এবং পশুটী খোঁড়া হইয়া যায়। রোগটী বড়ই স্পর্শাক্রামক। অনেক পশুই এই রোগে মারা পড়ে। এরূপ রোগগ্রস্ত পশুর দুগ্ধ কাহাকেও দিবে না। আক্রান্ত পশুগুলিকে অন্যত্র রাখিবে, অন্যান্য পশুর সহিত মিলিতে দিবে না। ঔষধ :—দুইপাউণ্ড (একসের) Epsom salt মহিষকে এবং ১½ পাউণ্ড (তিন পোয়া) গাভীকে খাওয়াইবে। ইহাতেও যদি জুলাপ না খুলে, তবে দুই সের পুরাতন মাত-গুড় দুই বেলা করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত দিবে। খাদ্য কোমল হওয়া চাই। ফটকিরির জল-দ্বারা মুখ ধৌত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ক্ষুরে আল্‌কাতরা লাগাইয়া দিবে; তাহা

হইলে তাহাতে মক্ষিকা বসিতে পারিবে না। গোয়ালের মেজেতে চুণ এবং তুঁতে ছড়াইয়া দিবে, কিন্তু আহার দিবার কালে পশুটীকে ঘরের বাহিরে আনিয়া খাইতে দিবে।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

নারীজীবন।

জীবন উষায়
হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ধুলায় ধূসর হ'য়ে
শিশু বালা যায়,
যা' দেখে আপন চোখে তুলিয়া লইছে মুখে
খাইবার তরে;
আধ আধ আধ বোলে, কত কি যে মুখে বলে,
কত কি যে করে!
মায়েরে দেখিয়া দূরে হামা দেয় বেগভরে
আনন্দের তানে;
জননীও হাসিমুখে ধরেন্ তাহারে বুকে
হৃদয়ের টানে।

তারপর হেরি,—
চপলা বালিকা যায় পথে ঘাটে আঙিনায়
খেলা করি' করি';
মুখে বলে কত কথা, বুঝে না মনের ব্যথা,
লাজ নাহি জানে;
সকল সংসার পাতি' কত খেলে দিবারাতি
সরল পরাণে;
জননী ডাকিছে তায়—"আয় বাছা বাড়ী আয়",
কেবা শুনে কথা!
খাওয়া দাওয়া ফেলি দূরে, বালিকা নিয়ত ফিরে
সাথীগণ যথা।

তারপর একি!
কেন সে লুকাতে চায়, খেলিতে নাহিক' যায়,
নত রাখে আঁখি!
চপলতা পায় লয়, শান্তভাব আগময়,
কি ভাবিতে যায়!
বদনে কথা না ফুটে, অধর কাঁপিয়া উঠে
লাজের বাধায়!
নবমীর শশী মত আধ অঙ্গ বিকশিত,
আধ দেয় রেখা;
মন আধ ফুটে রয়, পূর্ণতার পানে দেয়
চুপি চুপি দেখা!
তারপর সে যে
মন্থরগমনে যায়, কারো পানে নাহি চায়,
আরক্তিম লাজে!
পূর্ণ অঙ্গ বিকসিত, পূর্ণভাব উচ্ছলিত
মদবিন্দু-মাখা,—
যেন বিধাতার হাতে লাবণ্যের তুলিকাতে
প্রেম-ছবি আঁকা!
অন্তর দিয়েছে কারে, নিয়ত হেরিছে তারে
মানস-নয়নে,
সব কাজ ভুলে যায় শুধু তার অপেক্ষায়,—
বাঁধা সে যে প্রাণে!
একি অপরূপ!
তারপর হেরি তার মাতৃমূর্ত্তি অবিকার—
যেন স্নেহকূপ!
ভুলিয়া নিজের কথা ভাবে,—সন্তানের ব্যথা
ঘুচাবে কেমনে!
জীবন করিতে পণ সদা যেন সযতন
তাহারি কারণে;

চাঁদমুখ হেরি তা'র   ভুলে যায় জ্বালা-ভার,
না দেখিলে মরে !
তার সুখে সব সুখ,   তার দুখে সব দুখ
ভাবে সে অন্তরে ।
কি হেরি আবার !—
ল'য়ে কর্ম্মময় দেহ   ভাবিছে সে অহরহঃ
সংসারের ভার !
সে লাবণ্য ক্রমে টুটে,   মালিন্ত সেথায় ফুটে
কুঞ্চন-রেখায় ;
প্রগাঢ় আকার ধরি'   প্রেম থাকি' হিয়া ভরি'
মহিমা জাগায় !
রূপমোহ কাটি' যায়,   কর্ত্তব্যের ভাবনায়
আলোড়িত চিত ;
সংসারের রাণী ল'য়ে   সংসার-নায়িকা হ'য়ে
নিয়ত ব্যাপৃত !
তারপর হায় !
কি বিষাদ-মাখা ছবি !   তাহার জীবন-রবি
অস্তপথে যায় !
চর্ম্ম লোল, দেহ ক্ষীণ,   আঁখি-দুটী প্রভাহীন,
পলিত চিকুর !
পড়িয়া জরার গ্রাসে   অন্তর ঘরিছে ত্রাসে
চরণ বিদুর ।
সংসারের মায়া ঘিরে   বদ্ধ করিবারে তারে,
বৃথা সে প্রয়াস !
একদিন ডাক এল,   ছিন্ন করে নিয়ে গেল
সব মায়াপাশ !

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন ।

জ্ঞানীর প্রভাব

বা পিথাগোরাস্ ।

"এক চন্দ্র আলো করে জগৎ সংসার,
পুঞ্জ পুঞ্জ তারা হেরে না হরে আঁধার ।"

একচন্দ্র সমুদয় জগৎ-সংসার আলোকিত করে, কিন্তু শত শত তারকাবৃন্দ পৃথিবীর কণামাত্র আঁধারও নষ্ট করিতে পারে না। সেইরূপ একজন প্রকৃত জ্ঞানী লোক জগতের যতটা অজ্ঞানতা দূর করিতে ও উপকার করিতে পারেন্, শত শত অজ্ঞ লোক তাহার তিলার্দ্ধও পারে না। আমাদের দেশে একটা প্রবাদবাক্য আছে যে, 'যে ভাল খাইতে জানে, সে অন্তকেও ভাল খাওয়াইতে জানে,' কিন্তু সকলের পক্ষে একথা খাটে না। আমরা এমনও দেখিতে পাই, অনেকে নিজেকে লইয়া এরূপ ব্যস্ত থাকেন্ যে পৃথিবীতে তিনি ব্যতীত আর কেহ যে আছেন, এ কথা যেন তাঁর মনেই থাকে না। এই সকল আত্মসুখপ্রিয় লোকের দ্বারা জগতের উপকার সম্ভবপর নয়। যাহারা নিজের ন্যায় অন্তের সুখ-দুঃখও অনুভব করেন্, তাঁহারাই জগতের জন্ম কিছু করিয়া যাইতে পারেন এবং এইরূপ পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী পুরুষ-দ্বারাই জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি যখন নিজের ন্যায় অন্তের অন্তরের অজ্ঞানতা-দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তখনই তাঁহার জীবনের প্রভাব বিস্তারিত হইতে দেখা যায়। এখানে গ্রীস-দেশীয় তত্ত্বদর্শী খ্যাতনামা পণ্ডিত

পিথাগোরাসের জীবনের ঘটনাবলিতে এই কথার প্রামাণ্য দেখিতে পাই।

প্রথম বয়সে পিথাগোরাস জ্ঞানলাভের জন্য লালায়িত হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান; এবং পরে গৃহে ফিরিয়া পরিবারবর্গকে ও দেশবাসীকে এই আলোক-দানের জন্য বদ্ধপরিকর হন্। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার জীবনের প্রভাবে শুধু তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও ছাত্রগণই জ্ঞানী হন্ নাই, তাঁহার পরিচারকবর্গের জীবনেও তাঁহার জীবনের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

পিথাগোরাসের তিনটী কন্যা ও দুইটী পুত্র ছিল। পুত্রদ্বয়ের নাম টিলোগিস ও নিসারকস। ইহাঁরা উভয়েই পিতার ন্যায় তত্ত্বদর্শী হইয়াছিলেন। কন্যাত্রয়ের নাম এরিগনোট, ড্যামো ও মাইলা। এই তিনটী কন্যাই বিদ্যাবতী ও তৎকালের আদর্শ-স্থানীয়া হইয়াছিলেন। পিথগোরাসের স্ত্রী থিয়ানোও স্বামীর উপযুক্ত সহচরী ছিলেন। পিথাগোরাসের মৃত্যুর পর থিয়ানো পুত্রদ্বয়ের সহিত স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বহুদিন অধ্যাপনা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পিথাগোরাসের কন্যাদিগের লিখিত কতিপয় গ্রন্থও ছিল। তৎকালে তাঁহাদের সুপবিত্র চরিত্রের প্রভাবে তাঁহারা দেশবাসী ও জনসাধারণের বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। এস্থিয়স্ ও জ্যামোনিকস-নামক পিথা-গোরাসের দুইটী ভৃত্য ছিল, এই ভৃত্যদ্বয়ও তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল।

পিথাগোরাস তাঁহার ড্যামো-নাম্নী কন্যাকে স্বপ্রণীত গ্রন্থাবলী অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে-'জীবন যাইলেও এই গ্রন্থ কাহাকেও সমর্পণ করিও না।' এক সময়ে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেইসকল পুস্তক লইবার জন্য ড্যামোর নিকট উপস্থিত হন এবং বহু অর্থ দিবার প্রলোভন দেখাইয়া পুস্তকগুলি হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু পিতার উপযুক্ত পুত্রী তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া প্রত্যুত্তর দেন যে, 'আমি দারিদ্র্যক্লেশে নিপীড়িত হই সেও ভাল তথাপি পিত্রাদেশ-লঙ্ঘন করিতে পারিব না।"

পিথাগোরাসের জ্ঞানানুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি এতগুলি জীবনে জ্ঞানের দীপ জ্বালিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃত জ্ঞানানুরাগ মানুষকে যে কতদুর ত্যাগী ও মহাপ্রকৃতি করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা জগতের কি মহাকল্যাণ সাধিত হয়, পিথাগোরাসের জীবন তাহার একটী দৃষ্টান্তস্থল।

শ্রীমতী—

৺সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গজননীর সুসন্তান, বাঙ্গালীর গৌরব পূত-চরিত্র মনস্বী সার গুরুদাস্ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২রা নবেম্বর, সোমবার রাত্রি ১০টা ৫০ মিঃ সময়ে ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আসন্নকাল বুঝিতে পারিয়া তিনি একপক্ষকাল তাঁহার বাগ-

বাজারের গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই সময়ে তিনি কোন প্রকার ঔষধ সেবন করেন নাই।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী গুরুদাস-বাবু কলিকাতা-সহরে নারিকেলডাঙ্গায় জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সওদাগরী অফিসের ৫০৲বেতনে 'বুক-কিপার' ছিলেন। চরিত্রগুণে তিনি পরিচিত সকলেরই প্রিয় এবং সম্মানের পাত্র ছিলেন। গুরুদাসবাবু মাতা-পিতার পুণ্যফলে অশেষ সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। একমাত্র মাতৃদেবীই তাঁহার পিতা এবং মাতার উভয়েরই কার্য্য করেন। তিনি অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যা। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীও উচ্চ অঙ্গের ছিল। তিনি বলিতেন, "শৈশবকাল হইতে ছেলেমেয়ে-দিগের সম্বন্ধে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ও-গুলি মাটির পুতুল নহে যে, খানিকক্ষণ নাচাইয়া রাখিয়া দিবে। উহাদিগের মন আছে এবং সেই মনে ভালবাসার সহিত দূরদর্শিতার ছায়া প্রথম হইতেই ফেলিতে হইবে; উহারা সেই প্রীতির ও জ্ঞানের আভাস অজ্ঞাতসারেই লাভ করিতে থাকিবে।" তিনি কোনও পৌত্রবধূকে বলিয়াছিলেন, "ছেলে দুরন্তপনা করিতেছে বলিয়া তুমি বলিলে যে, 'মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিব', কিন্তু ও যখন দেখিবে যে প্রকৃতপক্ষে হাড় ভাঙ্গিয়া দিলে না, তখন উহার আর তোমার কথায় বিশ্বাস বা তোমার উপর সম্ভ্রম থাকিবে কি? মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বল বা যেমন উচিত ঠিক্ সেইটুকু শাসন কর।"—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসার তাঁহার 'এডুকেশন' বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তকে ঠিক্ এই উদাহরণটাই দিয়াছেন — সত্যপ্রিয়তা হইতে উভয় শিক্ষকই এই উপদেশ দিতে পারিয়াছিলেন। মাতাপিতাকে মিথ্যা-সংসৃষ্ট দেখিলে ছেলের সুশিক্ষা যে হইতে পারে না, সত্যপ্রিয়তা হইতে উভয়েই এই সূত্র ধরিতে পারিয়াছিলেন।

গুরুদাসবাবু শৈশব হইতে আম্র খাইতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার চারিবৎসর মাত্র বয়সের সময় তাঁহার মাতা ১লা আষাঢ়ে তাঁহাকে আম্র দিলেন না; বলিলেন, "আষাঢ় মাসে আর আম খাইতে হইবে না'। যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা হইবে, তাহাই খাওয়ার জিদ করিতে নাই। তুমি বল, 'আষাঢ় মাসে আম চাহিব না।" অনেক কান্নাকাটি করিলেও এবং ঘরে আম থাকিতেও তিনি তাহা দিলেন না। মারপিট না করিয়া শুধু পাখী পড়ানর চেষ্টার ন্যায় "আম চাহিব না" নিজেই বলিতে থাকিয়া শেষে শিশুকে দিয়া তাহাই বলাইলেন। শ্বশ্রূদেবী তাঁহাকে বলিলেন, "মা, দিলেই বা!—অত জিদ্ করছে।" তিনি একটু ক্ষুব্ধভাবে উত্তর দিলেন, "মা! আপনি বলিলে এখনই দিব। কিন্তু আজিকার চেষ্টাতেই ভোজ্যদ্রব্য-সম্বন্ধে উহা উহার জিদ ছাড়িতে শিখিবে। দেশকাল ভাল নয়, ব্রাহ্মণের ঘর।" একান্ত বশীভূতা সংযত অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যার মধুর ও অতিশয় বিনম্র অনুরোধ কখনই উপেক্ষিত হয় নাই; এ ক্ষেত্রেও হইল না। পিতামহীর সহিত মাতার মতের মিল দেখিয়া শিশু বলিল, "আম চাহিব না, আষাঢ় মাস।" বাটী শুদ্ধ সকলে একমত না হইলে শৈশবে সুশিক্ষা হয়

না। মাতার বিরুদ্ধে পিতামহীর নিকট 'আপীলে' সর্ব্বদা জয় হইলে শিশুর কর্ত্তব্যজ্ঞান দৃঢ় হয় না এবং আদিগুরু মাতাপিতার প্রতি ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানের মূলে একটু না একটু আঘাত পড়ে।

গুরুদাসবাবুর মাতা ভোজ্য বা পানীয় দ্রব্য কিছুই অনাবৃত রাখিতে দিতেন না। ধূলিকীটাদি পড়িলে ভোজ্য অশুচি হয়; তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদনের অযোগ্য। এক সময়ে ঐরূপ অনাবৃত অন্ন তিনি বাটীর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেন নাই। 'নিজেরা যাহা খাইব না, ঝি-চাকরকেও তাহা দিব না', তাঁহার এই ব্যবস্থা হয়। এই ক্ষতিতে লজ্জিত হইয়া পরিবারবর্গের শিক্ষা সুদৃঢ় হয়। তিনি যাহা ভক্তির চক্ষে প্রকৃত হিন্দু-ভাবে অতিসহজে ধরিতে পারিতেন, শুধু দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাহাই বিস্তর গবেষণার পর বলিতেছেন—"ভোজ্যদ্রব্য অনাবৃত রাখিতে নাই।"

গুরুদাসবাবু হেয়ার স্কুলের এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন এবং প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গণিতশাস্ত্রে এম-এ উপাধি লাভ করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। কলেজ হইতে বাহির হইয়া গুরুদাসবাবু জেনারল্ আসেম্বলি ইনষ্টিটিউসনে এক শত টাকা বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার মাতার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি বরাবরই কলিকতায় থাকেন—বাহিরে না যান্। বহরমপুরের আইনাধ্যাপকের কার্য্যে দুই শত টাকা এবং বহরমপুর কলেজে একঘণ্টা গণিত পড়াইলে একশত টাকা পাইবেন বলিয়া সটক্লিফ সাহেব গুরুদাসবাবুকে বিশেষ জিদ করেন। তাঁহার মাতুল মাতার মত-পরিবর্ত্তন করাইয়া বহরমপুর যাওয়ার মত করান্। বহরমপুর পৌছিলে সেই রাত্রিতেই গুরুদাসবাবুর মোহিনী-নাম্নী পরমসুন্দরী শিশুকন্যার কলেরায় মৃত্যু হয়।

বহরমপুরে গুরুদাসবাবুর সহজেই পসার হয়। টাকা জমাইয়া যখন মাসিক একশত টাকা সুদের কাগজ হইল, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে কলিকাতা ফিরিতে বলিলেন। জেনারেল অ্যাসেম্বলির চাকরীর যেন পূরা পেন্সন পাইলেন, এই মনে করিয়া কলিকাতা হাই-কোর্টে ঢুকিতে মাতৃদেবীর দ্বারা আদিষ্ট হইলে, গুরুদাসবাবু দ্বিরুক্তি করিলেন না। গুরুদাসবাবুর মাতা হাতে নগদ বারশত টাকা রাখিয়াছিলেন, যাহাতে সুদের টাকা লইয়া প্রতিমাসে দুইশত টাকা খরচ করিয়াও হাইকোর্টের পসারের প্রতীক্ষা করিতে পারেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গুরুদাসবাবু হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন; ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ডি-এল উপাধি লাভ করেন; ১৮৭৮ অব্দে ঠাকুর ল প্রফেসর নিযুক্ত হইয়া "হিন্দু-বিবাহ-আইন ও স্ত্রীধন"-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, ১৮৭৯ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ও ১৮৮৭ অব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হয়েন; ১৮৮৮ অব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী জজ হইয়া জানুয়ারী ১৮৮৯ হইতে জানুয়ারী ১৯০৪ পর্য্যন্ত হাইকোর্টের জজিয়তী করেন; ১৮৯০—৯৪ অব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সলার হয়েন; ১৯০২ অব্দে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটী কমিসনের সভ্য হয়েন; ১৯০৪ অব্দে নাইট বা সার উপাধি প্রাপ্ত হন্।

হাইকোর্ট হইতে অবসর-গ্রহণ করিয়া গুরুদাসবাবু দেশের শিক্ষা-সম্বন্ধে অধিকতর মনোযোগী হয়েন। ভারতবাসীর প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী দেখা যাইত। তাঁহার অভাবে ভারতবর্ষ আজ একজন প্রকৃত সদুপদেষ্টা হারাইয়াছে। এইস্থান পূর্ণ হওয়া সুকঠিন। সকল সমাজের সকল লোকেই তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিত;—সকলেই তাঁহার অকপট সরলতা এবং আড়ম্বর-বিহীন জীবনযাত্রা দেখিয়া মুগ্ধ হইত। তাঁহার সংস্কৃত-বিদ্যা এবং ইংরাজী-চর্চ্চা অসাধারণ ছিল। বড় বড় ইংরাজও তাঁহার ইংরাজী বলিবার বা লিখিবার শক্তিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।

তিনি ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রভৃতি বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

গুরুদাসবাবু দুই কন্যা এবং উপযুক্ত চারি পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফেসর শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "পোষ্ট গ্রাজুয়েট টিচিং" সভার সেক্রেটারী; দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তার শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের সভাপতি; তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়-বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, এবং চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর। হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় গুরুদাসবাবুর এক জামাতা।

[এডুকেশন গেজেট হইতে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত।]

গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য।

সংসার আশ্রমে যেরূপ সুগৃহিণীর প্রয়োজন, সেইরূপ সুবিজ্ঞ গৃহকর্ত্তারও আবশ্যকতা। "সুবিজ্ঞ এবং সাধুজনই গৃহস্বামীর উপযুক্ত।"

ট্যাসিটস্ বলেন, "পরিবারের কর্ত্তৃত্বকার্য্য এরূপ দুরূহ ব্যাপার যে, রাজ্য-শাসনও তাহার সমতুল নহে।" রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন করিতে না পারিলে, নৃপতি নিজেই অপদস্থ হয়েন, কিন্তু গৃহস্বামীর অবিজ্ঞতা- ও অসাধুতা-নিবন্ধন পরিজনবর্গের সকলেই কলুষিত ও সন্তপ্ত হয়েন;—এমন কি পুরুষানুক্রমে তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

নির্ব্বোধ লোক সংসারের কর্ত্তা হইলে যত অনিষ্ট হয়, অধার্ম্মিকজন কর্ত্তৃত্ব পাইলে তদপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গল ঘটে। গৃহকর্ত্তার অসাধু চরিত্রে ও কুদৃষ্টান্তে পরিজনবর্গের সকলেই অসচ্চরিত্র হইয়া পড়ে। যাহার কার্য্য-সকল অপবিত্র, কথাবার্ত্তায় পাপালোচনা, উপমা-সকল কুভাবে পরিপূর্ণ, তিরস্কার-পর্য্যন্ত অশ্লীল, তাহার পত্নী সন্তানগণ ও পরিজনবর্গ তাহার নিকট হইতে কি শিখিতে পারে? অপবিত্র সংসারে যে কেহ লিপ্ত থাকে, গৃহস্বামীর দৃষ্টান্তের প্রভাবে সকলকেই অল্পবিস্তর পাপ নিশ্চয়ই স্পর্শ করিবে।

এজন্য ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞতা সংসার-ধর্ম্মের

মূলীভূত উপাদান হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞতা যদিও সকল কর্ত্তৃপক্ষের ভাগ্যে না ঘটিয়া উঠে, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা তাঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা অনায়াসে ধীরতা শিষ্টাচার, ভদ্রতা, মিতাচার, মিতব্যয়িতা, শুদ্ধাচার, ধর্ম্মানুরাগ ও ভ্রাতৃভাব ও সহৃদয়তা দেখাইয়া সন্তান ও পরিজনবর্গকে ভদ্র এবং কর্ত্তব্যসাধনের উপযোগী করিতে সমর্থ হইতে পারেন। শান্ত, ধীর, ধার্ম্মিক জন যেখানে গৃহস্বামী সেই সংসারই প্রকৃত সুখময় শান্তি-নিকেতন। অতএব গৃহকর্ত্তার বিজ্ঞতা এবং ধার্ম্মিক হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞ না হইতে পারিলেও ধর্ম্মকে আশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই সংসার-সুখের একমাত্র প্রস্রবণ।

শ্রীমতী—

ঐন্দ্রজালিক।

(রূপক)

বর্ষার সন্ধ্যা। ক্ষুদ্র বৃদ্ধ চড়ুই কড়ি-কাঠের কোটরে বসিয়া মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে, আপন মনে উদাসপ্রাণে অতীত জীবনের আনন্দ-স্মৃতির ধ্যান করিতে-ছিলেন ; এমন সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র, আদরের নাতি—শ্রীমান্ তরুণচন্দ্র পাখা ঝট-পট্ করিয়া দ্রুত উড়িয়া আসিয়া হাজির! বৃদ্ধ বলিলেন, "কি হে, এমন সময় যে?"

স্বভাবসুলভ-চপলতা-সহকারে বৃদ্ধ পিতা-মহকে বেষ্টন করিয়া, তুড়্ তুড়াতুড়্ শব্দে লঘু নৃত্যে একচক্র নাচিয়া তরুণ ঠাকুর-দাদার গা ঘেঁসিয়া বসিল ; চকমকে চাহনিতে এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া, চুপি চুপি বলিল, "মুস্কিলে পড়েছি, ঠাকুর-দা, শূন্য ঘরে মন টিকল না, তাই তোমার কাছে ছুটে এলুম্।—"

সবিস্ময়ে ঠাকুর-দাদা বলিলেন, 'কেন হে! বাড়ী শুদ্ধ লোক গেল কোথা?"

তরুণ উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—"সবাই আছে ঠাকুর-দা,—কিন্তু—!" একটু থামিয়া বলিল "কেউ নাই, কেউ নাই!—" তাহার এই স্বর ভয়ানক হতাশা-মিশ্রিত!

ঠাকুর-দাদা ভয় পাইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তরুণ বলিল, "আমার শ্বশুর-ম'শাই এসেছেন, বাবা বৈবাহিককে নিয়ে আসর জাকিয়ে বসে গল্প জুড়েছেন!—বাড়ীশুদ্ধ সবাই সেখানে হাজির ; কাজেই, শূন্য ঘরে···বুঝ্লে ঠাকুরদা, কেমন করে টিকি?"

ঠাকুর-দাদা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রক্ষে পাই। এই নিয়ে মারামারি! আমি বলি, বুঝি, আরও কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে থাকবে·····!" একটু হাসিয়া বৃদ্ধ গোটা-দুই ছোট্ট পরিহাস করিলেন! সে-পরিহাস অত্যন্তই পরিষ্কার, সোজাসুজি। তাহাতে মিথ্যার মিষ্টতা এতটুকুও ছিল না;—ছিল শুধু সুস্পষ্ট সত্যের তীব্র ঝাল!

নাতি অপ্রস্তুতে পড়িয়া বিব্রত হইয়া

উঠিল! ঠাকুর-দাদা সেটুকু লক্ষ্য করিয়া, আস্তে আস্তে নিজের পাকা-মাথাটি তরুণের কাঁধের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "চপল উচ্ছ্বাস-প্রিয় যুবক,—তোমরা স্বভাবের ওপর এত ভীষণ অস্বাভাবিকতার আতিশয্য এনে ফেলেছ যে, তোমাদের সচেতন প্রাণী বলে ভেবে নিতে আমার সময় সময় দ্বিধা-বোধ হয়!—ওহে উচ্ছৃঙ্খলতা-ধর্ম্মী স্নেহাস্পদ, —সংযম বলে একটা শব্দ সংসারে আছে, শুনেছ কি?—"

মাটীর দিকে চাহিয়া সলজ্জ মুখে তরুণ বলিল, 'বেয়াদবি মাপ কর, ঠাকুর-দা, কান মলছি তোমার কাছে।"

নাতির হাত ধরিয়া বৃদ্ধ তাহাকে নিরস্ত করিলেন। ক্ষুদ্র চক্ষুর অগ্রভাগে সস্নেহে তাহার ললাট-চুম্বন করিয়া কানে কানে বলিলেন, "ওটা নাত্-বৌয়ের দরবারে কোরো বন্ধু! এ-সব অপরাধের জন্য সেই-খানে ক্ষমা চাওয়াই প্রশস্ত বিধি।—"

কথাটা চাপা দিবার জন্য তরুণ জোর গলায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ধন্যবাদ, উপদেশের জন্য বহু ধন্যবাদ ঠাকুর্দা!—এখন একটা ভাল গল্প স্বরু কর দেখি! বর্ষার সন্ধ্যাটা মাটী হয়ে যাচ্ছে!—"

বাহিরের বৃষ্টি-সজল বিশ্বপ্রকৃতির পানে চাহিয়া বৃদ্ধ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "বর্ষার সন্ধ্যা জমিয়ে তোল্‌বার ভার পড়্‌ল এই বৃদ্ধের উপর! বড় অবিবেচনা কর্‌লে হে! তরুণদের মনস্তুষ্টি-সাধনের জন্য হাসির গান কি ঠিক্ তেমন মধুর স্বরে এ বৃদ্ধের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হতে পার্‌বে!—"

তরুণ বলিল, "পারবে ঠাকুর্দা! ভড়্‌কাচ্ছ কেন? চালিয়ে যাও!—"

করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "না বন্ধু, অমন হঠকারিতায় আমি রাজি নই। মনে যখন হাসি নেই, তখন মুখে সেটা ফুটিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌লে—চোখের জলের তোড় অত্যন্ত বেড়ে উঠ্‌বে এবং ঠোঁটের ফাঁকে দাঁত-খামটি-টাও ভয়ানক নিষ্ঠুর দৃশ্য হয়ে দাঁড়াবে! অতএব ক্ষমা কর।"

ক্ষুণ্ণ হইয়া তরুণ বলিল, "আমি যে তোমার কাছে গল্প শোন্‌বার জন্যই এসেছি, ঠাকুর্দ্দা! —নিরাশ হয়ে ফির্‌ব?—না হয়, কাঁদাও একটু!—"

"তাইত—" বলিয়া বৃদ্ধ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে খানিক ক্ষণ কি ভাবিলেন; তারপর মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমায় খুসী কর্‌বার জন্যে মিথ্যে দিয়ে গল্প বানিয়ে আজ শোনাতে পারব না। একটা সত্য ঘটনা সোজাসুজি বলে যাচ্ছি,—বরদাস্ত কর্‌তে পার্ ত কান পেতে শোন। তারপর হাসি বা কান্না, যা উচিত বিবেচনা হয়, কোরো।"

স্ফূর্ত্তির সহিত পালক ফুলাইয়া, গা-ঝাড়া দিয়া, নখর-কঙ্কতিকায় মাথার চুল আঁচ্‌ড়াইয়া, দেহ-প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া, শ্রীমান্ তরুণ ভব্যযুক্ত হইয়া বসিল। বৃদ্ধ পা-দুইটি গুটাইয়া, বুকে ভর দিয়া বসিয়া শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে গল্প স্বরু করিলেন।—

"সে অনেক দিনের কথা। তখন তোমা-রই মত আমার বয়স। আজিকার এই বার্দ্ধক্যের তীব্র জড়তা তখন আমায় আক্রমণ করিতে পারে নাই;—আমি তখন তোমারই মত অমনি অধীর ও চঞ্চল ছিলাম। আজ প্রবীণত্বের গৌরবে পাকা-পোক্ত হইয়া,—

অগাধ আলস্যের মাঝে অটল হইয়া বসিয়া আছি, কিন্তু এখনকার দিনের আলস্য-সম্ভোগ আমি অসহ্য ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম্।

"খাবার খাইয়া পেট ভর্ত্তি হইবার পর, অকারণ ব্যস্ততায় আকাশময় মহা ঔৎসুক্যে ছুটাছুটি জুড়িয়া দিতাম! কখনও বা লম্বালম্বি ছুট কাটাইয়া পৃথিবীর শেষ প্রান্তটা দেখিবার জন্যে মহাস্ফূর্ত্তিতে উধাও হইতাম!—সে নিরুদ্দেশ যাত্রা কি অসীম উল্লাসময়! মনে অশ্রান্ত কৌতূহল, প্রাণে অদম্য সাহস, শরীরে অপর্য্যাপ্ত শক্তি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ক্রোশের পর ক্রোশ অবহেলায় অতিক্রম করিয়া চলিতাম্! তারপর অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িতাম!

"এমনি করিয়া একটানে ছুটিতে ছুটিতে একদিন গ্রীষ্ম-দ্বিপ্রহরের কড়া রোদ্রে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিলাম; ভারী ক্লান্ত হইয়াছিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ফিরিবার পথে সন্ধ্যার সময় একটা লোকালয়ের শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছিয়াছি, তখন হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর মেঘ আকাশে আসিয়া বিষম ঝড় তুলিল! সে ঝড়ের গতিবেগ ঠেলিয়া, পাখা ঝাপ্‌টা দিয়া বেশী দূর উড়িয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে দেখিয়া আমি প্রমাদ গণিলাম! রাত্রির মত একটা আশ্রয় চাই।—প্রাণপণে ছুটিলাম। —নিকটেই একটা মানবগৃহ দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। বিনা দ্বিধায় সামনের খোলা বাতায়ন-পথে তাড়াতাড়ি একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম!

"তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক্‌টায় চাহিলাম। বৃহৎ ঘরখানা বোঝাই হাজার রকমের নির্জ্জীব আস্‌বাব। তা'র মধ্যে একটিমাত্র সজীব মানুষ!—আমি সন্দিগ্ধ ভাবে বার বার তাহার দিকে চাহিলাম, কিন্তু দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম,—সে আমায় আদৌ লক্ষ্য করিল না। আমি নিঃশব্দে ছুট্ করিয়া আসিয়া ঘরের কোণে কড়িকাঠের ফাঁকে আশ্রয় লইলাম। সে ইহা জানিতে পারিল না। —জানালার কাছে, অপরিষ্কার ক্ষুদ্র বিছানায় শুইয়া, বাহিরের মেঘাড়ম্বরময়ী আকাশের দিকে অসহায় উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে নিষ্পন্দ-দেহে পড়িয়া রহিল। দৃষ্টিও তাহার স্থির নিষ্পলক রহিল।

"বাহিরে ক্রমে মেঘের পরে মেঘ জমিল কড়্ কড়্ করিয়া বজ্র ডাকিল, চক্‌মক্ করিয়া বিদ্যুত হানিল, তারপর ঝড়্ঝড়্ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে লাগিল। ঘরের মধ্যে জল আসিতে লাগিল। লোকের নিষ্পলক নয়নে, চেতনার আভস ফুটিয়া উঠিল। সে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে একটু নড়িল; পাশ ফিরিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল; পারিল না, পড়িয়া গেল। একটা হতাশ যন্ত্রণার ব্যাকুল আর্ত্তনাদ বায়ুস্তরে অলক্ষ্যে মিলাইয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে আবার আকাশে বিকট বিদ্যুচ্চমকের সহিত উৎকট কর্কশ বজ্র-নির্ঘোষ শুনিতে পাওয়া গেল। লোকটা এবার আকুল আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠিল।

"বাহির হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে এতটুকু সান্ত্বনা দিল না, এতটুকু সাহায্য করিল না! আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল! কড়িকাঠের ফাঁক হইতে গলা বাড়াইয়া ভাল করিয়া তাহার অবস্থাটা দেখিবার প্রয়াস পাইলাম। ও হরি!—হতভাগ্যটা যে খঞ্জ, রুগ্ন! শুধু কি তাই! তাহার হাত-দুটা! হায় ভগবান্, ভয়াবহ গলিত কুষ্ঠে তাহার

দশটা অঙ্গুলের একটারও যে চিহ্ন অবশিষ্ট নাই।

"আমি অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম! মরি রে! সেই পরাধীনতার ব্যথা-কুঞ্চিত মলিন নিষ্প্রভ নয়নে কি শোচনীয় দুঃখের রূপ বর্ত্তমান! ললাটের যন্ত্রণাকুঞ্চন-রেখায় যেন জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—'চির নিরুপায়—ক্রীতদাস'।

"লোকটা প্রাণপণ উদ্যমে অনেক চেষ্টায় উঠিয়া বসিল; তারপর কাঁচের জানালাটা টানিয়া দাঁতে ঘুরাইয়া ছিটকানি আঁটিয়া দিল। এইটুকু পরিশ্রমেই সে অসহ্য ক্লান্তিতে হাঁপাইতে লাগিল; অনেক কষ্টে হাত্ড়াইয়া শয্যার শিয়র হইতে একটা ছোট বোতল দুইহাতে ধরিয়া টানিয়া আনিল; দাঁতে করিয়া তাহার ছিপি খুলিয়া তাহার ভিতরের তরল পদার্থটুকু নিঃশেষে গলায় ঢালিয়া দিল।

"ওঃ! ও তবে মদ্যপ। এই ভাবিয়া অসহনীয় ব্যথার সহিত বিজাতীয় ঘৃণা বোধ হইল। হায়! একেই ত ভগবান্ উহার অদৃষ্টে মহাব্যাধির মৃত্যুর যন্ত্রণা চির-জীবন-ব্যাপী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপর নির্ব্বোধ লক্ষীছাড়াটা আবার ঐ আত্মঘাত-পাপতুল্য নিদারুণ বিশ্রী নেশার অধীন! ধিক্ ধিক্! কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিতেই ধীরে ধীরে তাহার ভাবপরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ক্রমে সে অধীর, উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কড়িকাঠের নিরাপদ্ কোটর হইতে চ্যুত হইয়া অসাবধানে ঘরের মেজেয় পড়িলে, আমাদের ভয়কাতর শাবকগুলি ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় যেমন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, তাহার বুকের ভিতর-কার হৃৎপিণ্ডটা তেমনি করিয়া সশব্দ-স্পন্দনে দ্রুত কাঁপিতে লাগিল। নিষ্ফল ব্যগ্রতায় উৎ-ক্ষিপ্তভাবে সে শয্যাময় হাত্ড়াইতে লাগিল;—তারপর অসহ্য আবেগে শয্যার উপর আছ-ড়াইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু কি নিদ্রার মাঝে, ঠিক্ বলিতে পারি না—তাহার দেহ স্থির নিস্পন্দ হইয়া গেল।

"আমি ভীরু চড়ুই হইলেও তখন যুবা বয়সের প্রাণী, কাজেই কৌতূহলী। জনশূন্য আলোকহীন গৃহে সেই নিস্পন্দ শায়িত দেহটাকে সন্তর্পণে একবার পরীক্ষা করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইল;...একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া নিঃশব্দে ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া নামিয়া আসিলাম; শয্যার শিয়রে বসিলাম। তারপর তুড়ুক্ তুড়ুক্ করিয়া লাফাইয়া তাহার নিকটস্থ হইয়া উঁকি ঝুঁকি দিয়া তাহার মুখ-চোখের অবস্থাটা দেখিবার চেষ্টা করিলাম,—কিন্তু হঠাৎ পিছাইলাম! উঃ কি গরম! তাহার ব্রহ্মতালুর ভিতর হইতে অগ্নিজ্বালাময় ভীষণ উত্তাপ বাহির হইতেছে! পালকের জামার নীচে গাত্রচর্ম্মে তাহার তাপ আসিয়া ঠেকিল; চক্ষের নিমেষে চম্পট দিলাম! কড়িকাঠের মাথার নিরাপদ্ স্থানে বসিয়া ব্যগ্র কৌতূহল দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম।

"সেটা ভীষণ উত্তাপই সত্য; অন্ধকার ঘর-খানা সে উষ্ণ ঝাঁঝে যেন আশ্চর্য্য আলোকময় হইয়া উঠিল!—ক্রমেই উত্তাপটা তীব্রতর—স্পষ্টীভূত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহা অগ্নি-শিখা-প্রোজ্জ্বল একটা চমৎকার জ্যোতির্ম্ময় আলোক-তরঙ্গে পরিণত হইল। তরল-স্রোত বহিয়া আসিয়া দেহটার শিয়র দেশে পুঞ্জীকৃত হইয়া জমাট বাঁধিল। ক্রমে তাহা

একটা অপূর্ব্ব সুন্দর মানব-মূর্ত্তিতে পরিণত হইল।

"মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ উজ্জ্বল। মর-জগতের উর্দ্ধে যদি কোন অপার্থিব প্রসন্ন সৌন্দর্য্য-মাধুরী থাকে,—সে মূর্ত্তি, বোধ হয়, তাহারই সত্তায় সুগঠিত।

"মূর্ত্তি স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সম্মুখের ব্যাধি-বিকলাঙ্গ কুৎসিত মানব-মূর্ত্তিটা, বোধ হয়, তাহার চোখে ঠেকিল না।—সে স্তব্ধ নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, কাচাবরণ-মণ্ডিত জানালার বাহিরে আকাশের দিকে!—আমি কড়িকাঠের গুপ্ত আশ্রয়ে বসিয়া দেখিতে পাইলাম না,—সে বাহিরের দিকে একান্ত আগ্রহে চাহিয়া কি দেখিতেছে;—কিন্তু দেখিলাম তাহার সুন্দর মুখ, গভীর আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দৃষ্টি যেমনই মুগ্ধ-মনোরম, তেমনই শান্ত-কোমল!—

"কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ সজোরে ডানহাত তুলিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম! হরিবোল হরি!......এতক্ষণ দেখি নাই, এই শান্ত সুকুমার প্রিয়দর্শন মানুষটার হাতে—ঠিক যেন তীক্ষ্ণ নৃশংসতা-মাখান একটা ভয়ানক চক্‌চকে উজ্জ্বল ছোরা!

"আমি ভয়ে ঘাড় গুঁজিয়া চক্ষু বুজিলাম, ক্ষণপরে চক্ষু খুলিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আতঙ্কে প্রাণ উড়িয়া গেল!—দেখিলাম, লোকটা, সেই শয্যার উপর পতিত অচেতন দেহটার পাঁজরে ছোরাখানা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে!

"দেহটা তীব্র যন্ত্রণায় সজোরে ধড়্‌ফড়্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হত্যাকারীটা তাহার দিকে দৃক্‌পাত করিল না;—অম্লান বদনে অকম্পিত হস্তে ছোরাটা টানিয়া তুলিল!—

"রক্তস্রোত ফিন্‌কি দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে সকৌতুকে হাসিতে হাসিতে তাড়াতাড়ি একটা মাটীর পাত্র আনিয়া তাহাতেই রক্তটা ধরিল। ক্ষণপরে রক্তের পাত্রটা ঘরের মেঝেয় নাবাইয়া রাখিয়া সে জানালার কাছে সরিয়া গেল। বাহিরে বজ্র-জল তখনও চলিতেছিল কি না, জানি না, কিন্তু সামান্য আলোক আসিতেছে, দেখিলাম। সেই ক্ষীণ আলোকে রক্তমাখা ছোরাখানা চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া সে গভীর মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিল। স্বর্গের সন্তোষে তাহার মুখ ভরিয়া গেল। সে নত হইয়া যুক্ত করে, মনে হইল, যেন কাহার উদ্দেশে নমস্কার করিল; তারপর ছোরাটা মুখে পুরিয়া অবলীলাক্রমে গিলিয়া ফেলিল!

"পরে সরিয়া আসিয়া সে সেই রক্ত-পাত্রটার কাছে বসিল। সরল শিশুর তরল চপল কৌতুকের হাসিতে আবার তাহার সুন্দর মুখ ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল! ঘরের কোণ হইতে একটা ছোট 'খড়ের নল' কুড়াইয়া, হাসিতে হাসিতে মুখে লাগাইয়া, সেই রক্তের ভিতর ডুবাইয়া সে 'ফুঁ' দিয়া বুদ্বুদ তুলিতে লাগিল!

কি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! দেখিতে দেখিতে সেই বিচিত্র-বর্ণের-বুদ্বুদ-রচিত কত কি আশ্চর্য্য-বস্তু প্রস্তুত হইল! কি বিরাট তাহাদের আকার! কি চমৎকার তাহাদের উজ্জ্বল শোভা!...... আমি কিছুই বুঝিলাম না, বিস্ময়-স্তম্ভিত-নয়নে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলাম!

"বহুক্ষণ-পরে, একাগ্র মনোযোগে ক্রীড়ারত লোকটা হঠাৎ চট্‌কা ভাঙ্গিয়া লাফাইয়া উঠিল! তাহার মুখখানা অস্বাভাবিক বিবর্ণ হইয়া গেল! সে কাঁপিতে লাগিল, তাহার দেহটা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল! হঠাৎ সে অদৃশ্য হইয়া পূর্ব্বের মত একটা আলোক-তরঙ্গে পরিণত হইল! সেই জ্যোতিঃ তরঙ্গ-রেখা হিল্লোলিত হইয়া আসিয়া, সেই শয্যা-শায়িত দেহটার ব্রহ্মরন্ধ্রে সংলগ্ন হইল। ক্রমে তাহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল!

"মৃতদেহটা নড়িয়া উঠিল! আমি ভয়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার ক্ষতস্থানে ক্ষত-চিহ্ন নাই! আছে শুধু অতি-ক্ষীণ একটু শুষ্ক-শোণিত-রেখা!

"শয্যাশায়িত লোকটা উৎকণ্ঠাকুল নয়নে শুষ্ক মুখে চারিদিকে চাহিল, তারপর প্রাণপণ আকিঞ্চনে উঠিয়া বসিল।—ব্যগ্রব্যাকুল হইয়া, দুই হাতে উদ্বেগ-স্পন্দিত বুকটা চাপিয়া ধরিয়া সেই রক্তের বুদ্বুদ-উদ্ভূত অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক বস্তুগুলার পানে চাহিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া গেল!

"রাত্রির কুয়াশা কাটিয়া ভোরের আলোক দেখা দিল।—জানালার কাচের ভিতর হইতে বাহিরের মেঘশূন্য নীলাকাশের একটুকরা মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; চারিদিকে দ্রুত দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া ভাবিলাম, কোন্ ফাঁক দিয়া বাহির হই? চারিদিক্ই যে বন্ধ!

"হঠাৎ সশব্দে গৃহদ্বার ঠেলিয়া একদল লোক হুড়্ হুড়্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বিচিত্র কণ্ঠে বিকট চীৎকার জুড়িয়া দিল!......সহস্র তর্ক, যুক্তি, প্রশ্ন, উত্তর, তাহারা যথেচ্ছভাবে আপনা আপনি মীমাংসা করিয়া লইল। তার-পর কেহ দম্ভভরে বিদ্রূপ করিল, কেহ ক্রুদ্ধ-স্বরে তিরস্কার করিল, কেহ কঠোর ঘৃণায় ধিক্কার দিল! সেই হতভাগ্য নির্ব্বোধটা অর্থহীন দৃষ্টি তুলিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল।

"উদ্ধত অবজ্ঞায় তাহার পিঠে লাথি মারিয়া, মুখে থুতু ফেলিয়া, দলকে দল ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল; রহিল শুধু অবশেষের দুইজন!—তাহারা দুইজনেই প্রশংসামুগ্ধ দৃষ্টিতে একত্রে মনোযোগে এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া সেই ঐন্দ্রজালিক কীর্ত্তি দেখিতেছিল। এইবার দুইজনে অগ্রসর হইয়া, প্রসন্ন উল্লাসে সমস্বরে জয়ধ্বনি করিল!

"নির্ব্বোধটা মূকের মত বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল; কিছু বলিল না।

"তাহারা আবার জয়ধ্বনি করিল। ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে আর একজন সবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। হিংস্র ব্যাঘ্রের কঠোর উত্তে-জনায় সেই নির্ব্বোধটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিষ্ঠুরভাবে সে তাহার বুকে উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত করিল।—হতভাগার বুকের চামড়া কাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিল! কিন্তু মুখে তাহার এতটুকুও বেদনার চিহ্ন দেখা গেল না! সে শুধু হতভম্ব হইয়া প্রহারকর্ত্তার ক্রুদ্ধ ভীষণ মুখখানার প্রতি চাহিয়া রহিল।

"শুনিলাম, হতভাগ্য নির্ব্বোধ ইহারই অন্ন-পুষ্ট, আশ্রয়ে পালিত—হতভাগ্য ক্রীতদাস।

"পদাঘাতে ভূমি কাঁপাইয়া, শাসনের বেত্র

আস্ফালন করিয়া প্রভু কর্কশ নিনাদে গর্জ্জন করিলেন ......'এত সাহস! এত স্পর্দ্ধা! অন্ন-দাতা প্রভুর অনুগ্রহ-ভিক্ষু, জঘন্য-জীবন লইয়া নিভৃত বিরাম-কুটীরের মাঝে মাথা গুজিয়া বিশ্রাম করিবার একটু স্থান পাইয়াছে বলিয়া সে কি না স্বচ্ছন্দে এমন দুঃসহ স্বেচ্ছার স্পর্দ্ধা-প্রকাশ করিবে!—কোন্ সাহসে সে এমন অসমসাহসিকতা প্রকাশ করিল?'

"ভৃত্য কোনই উত্তর দিল না; মাটীর দিকে চোখ নীচু করিয়া নীরব রহিল। প্রভু সদর্পে তাহার মাথায় পদাঘাত করিয়া গেলেন।

"জয়ধ্বনিকারী লোক-দুইজন স্তম্ভিতনেত্রে চাহিয়া ছিল। এইবার তাহারা ব্যথিত ম্লান মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিল! তাহার মাথার ধূলা, পিঠের ধূলা ঝাড়িয়া, সস্নেহে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে তাহাকে উৎসাহ দিল।—নির্ব্বোধ তবুও কোন কথা কহিতে পারিল না; লাঞ্ছনাহত করুণ-নয়নে নির্ব্বাগ্‌ভাবে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল! তাহার দুই চক্ষুর প্রান্ত বহিয়া শুধু দুইটি ফোটা তপ্ত অশ্রু টস্ টস্ করিয়া বুকে খসিয়া পড়িল।

"একজন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কি অন্যায়! ওরা নির্ব্বিচারে তোমার ওপর নিষ্ঠুর অত্যা-চার করে গেল?—'

"ম্লান হাসি মুখে টানিয়া, ভগ্নকণ্ঠে নির্ব্বোধ উত্তর দিল—"যেতে দাও বন্ধু,—ওঁরা ওতেই যদি পরিতৃপ্ত হন, হতে দাও।—'

"ফুলের মালা হাতে করিয়া অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি গম্ভীর স্বরে বলিল, 'কিন্তু আমরা তোমার মহত্ত্বের অপমান করতে পারব না। আমরা প্রীতিভরে তোমায় এই সম্মানের অর্ঘ্য উপহার দেব।—ধর বন্ধু......"

"সভয়ে পিছাইয়া নির্ব্বোধ কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিল,—"না না, বন্ধু, ক্ষমা কর—আমি এ সম্মানের অযোগ্য,—আমি যে এর কিছুই জানি নে!"—

"তাহারা চমকিল! বিস্ময়-ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল—'এই অজস্র ব্যয়িত শোণিত, এ কি তোমারই পঞ্জর-নিঃসৃত নয়?'

"সে মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল "হাঁ—।" পুনশ্চ প্রশ্ন হইল, "এই সুন্দর কীর্ত্তি, এ ইন্দ্রজাল তোমারই স্ব-কর-সৃষ্ট নয়?'—

"ক্ষুণ্ণ বেদনার হাসি হাসিয়া নির্ব্বোধ তাহার সেই কুষ্ঠক্ষত-শীর্ণ অকর্ম্মণ্য হাত-দুইখানি তুলিয়া দেখাইল, এ হাত যে অক্ষম! তারপর দৃঢ়ভাবে মস্তক-সঞ্চালনে নিঃশব্দে জানাইল—"না—!"

"প্রশ্নকর্ত্তা অবাক্ হইয়া গেল! অনেকক্ষণ চুপ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তবে? তবে এ কার কীর্ত্তি? জান, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা? কোথায় তা'র নিবাস?—"

"মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বোধের বুকটা প্রচণ্ড-বেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কোন উত্তর দিতে পারিল না!—নৈরাশ্যকাতর উদাস দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে আকাশের দিকে হতবুদ্ধির মত সে চাহিয়া রহিল।—

"প্রশ্নকর্ত্তা তাহার দৃষ্টি-লক্ষ্যে বাহিরের দিকে ত্রস্ত চকিত কটাক্ষপাত করিল, তারপর ছুটিয়া আসিয়া, কাঁচের জানালা খুলিয়া ফেলিয়া, বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, ব্যস্ত চঞ্চল দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে নিষ্ফল ঔৎ-

খুকো অনুসন্ধান করিতে লাগিল! কিন্তু কোথায় কে!—

"নির্ব্বোধ হতাশ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল! হায়, সে হতভাগ্য নিজেও জানিতে পারিল না—তাহারই বুক-ভরা বেদনার আবেগ, উন্মাদ-আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাহারই সতেজ-মস্তিষ্কে যে তীব্র আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল, সেই আগুনেই বিরাট্ চৈতন্যময় এক মহতী মঙ্গলশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল!—তিনিই তাহার মানবীয় দেহের দুর্ব্বল বক্ষে, শাণিত কঠিন লৌহ হানিয়া রোগদুষ্ট শোণিত টানিয়া বাহির করিয়া সেই রক্ত মাটীর পাত্রে ধরিয়াছিলেন। তারপর সরল শিশুর চপল কৌতুক-আনন্দে মাতিয়া ঐন্দ্রজালিক ফুৎকারে সেই রক্তে বুদ্বুদ গড়িয়া এই আশ্চর্য্যজনক ঐন্দ্রজালিক-কীর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন! হায়, ইহারা এখন বাহিরে কোথায় তাঁহাকে খুঁজিতে চায়!—"

• • •

বৃদ্ধ চুপ করিলেন। তরুণ মাথা তুলিয়া সাগ্রহে বলিল, "তারপর?—"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তারপর আর কি? খোলা জানালা পেয়ে আমি সুড়ুৎ করে তা'র মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে পড়্লুম, তারপর মুক্ত আকাশের বায়ুপ্রবাহে পাখা-সঞ্চালন করে সন্ সন্ শব্দে নিজের ডেরায় ছুট্‌লুম্।—"

তরুণ হতাশভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, —"নিজের ডেরায়! পুলীশে খবর দিতে গেলে না? এমন ভয়ানক খুন-জখমের চমৎকার গল্পটা ডিটেক্‌টিভের হাতে পড়্ল না; গল্পটা মাঠে মারা গেল!—"

ঈষৎ হাসিয়া বৃদ্ধ চড়ুই মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "যেতে দাও, সুহৃদ, জবরদস্তি করে রুদ্ধ গৃহের বদ্ধ বাতাসে আটকে রেখে বিষজীর্ণ করে মেরে ফেলার চেয়ে মুক্ত আকাশের কোলে খোলা মাঠের মেঠো হাওয়া খেয়ে মরা—ঢের স্বাস্থ্যকর! তুমি এখন নিজের ডেরায় যাও, তোমার শূন্যঘর এতক্ষণ নিশ্চয় পূর্ণ হয়েছে।—রাত্ ন'টা বাজে!

(সমাপ্ত)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। High courts' Instructions to and Regarding Police Officers (পুলিস্-কর্ম্মচারিগণের প্রতি ও তাহাদিগের সম্বন্ধে উচ্চ-বিচারালয়-সমূহের বিধি)।—শ্রীযুক্ত এইচ্ ব্যানার্জ্জি, বি এল্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত, গ্রথিত ও গিরিধি হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এলাহাবাদ, বোম্বে, মান্দ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় উচ্চ-বিচারালয়গুলির পুলিস্-সংক্রান্ত বিধি-সমূহ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার সাতটী অধ্যায়ে পুলিস্-কর্ম্মচারী, পুলিসে সংবাদ, পুলিস্ রিপোর্ট, বন্ধন, কারারোধ, জামিন্, অনুসন্ধান, পুলিসের নিকট স্বীকারোক্তি, প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞাতব্য

বিষয় অতিসুন্দরভাবে গ্রথিত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা পুলিস্-কর্ম্মচারী, আইন-ব্যবসায়ী, আইন-পাঠার্থী এবং পুলিসের শিক্ষাধীনে অবস্থিত ছাত্রগণের পক্ষে যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণ ব্যক্তি-গণেরও জ্ঞাতব্য বহুবিধ বিষয় ইহাতে বিদ্যমান আছে। আমরা আশা করি, গ্রন্থকারের পরিশ্রম অচিরেই সার্থকতা লাভ করিবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিগত ২রা নবেম্বর মহাত্মা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা এবং আমাদিগের মাতৃভূমি একটী উজ্জ্বলতম রত্ন হারাইলাম! মানুষ কেহই চিরদিনের জন্য এখানে আসে না। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় কৃতী মনীষীর উজ্জ্বল চরিত্র যুগযুগান্তর ধরিয়া দেশ-বাসী আগ্রহ-সহকারে হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখে। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেও, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তাঁহার সেই ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, তাঁহার নিরহঙ্কারতা ও নিরভিমানতা, তাঁহার সেই সরল ও অমায়িক মধুর ব্যবহার, তাঁহার সেই গভীর জ্ঞানানুরাগ ও দেশবাসীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও রাখিবে। স্বদেশবাসীদিগের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক্। বিধাতা তাঁহার চিরোন্নতিশীল আত্মার চির উন্নতি বিধান করুন এবং দেশবাসীকে তাঁহার সদৃষ্টান্তানু-সরণে শক্তি প্রদান করুন।

মহিলাদিগের প্রার্থনা।—আমেরিকার কতিপয় রমণী প্রেসিডেন্ট উইলসনের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, আমেরিকার কয়েক-জন মহিলাকে ইউরোপের শান্তি-সমিতিতে যোগদান করিবার সুযোগ দেওয়া হউক্।

রমণীদিগের এ প্রার্থনা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

নারীর কার্য্য।—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ এক প্রকাশ্য সভায় নারীদের কার্য্যদক্ষতার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের দশ লক্ষ নারী গোলাগুলি, বন্দুক ও কামানের নির্ম্মাণকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিন লক্ষ ষাট হাজার নারী কৃষিকার্য্য, দুই লক্ষ কুড়ি হাজার নারী জল- ও স্থল-সৈন্যের শুশ্রূষা-কার্য্য এবং বহু সহস্র নারী নানাপ্রকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মন্ত্রিমহোদয় বলিয়াছেন, 'নারীর সাহায্য না পাইলে আমরা যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিতাম না।'

বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব লেডী প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গীয়া কুমুদিনী দাস।—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব লেডী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীমতী কুমুদিনী দাস মহাশয়া কয়েকদিনের পীড়ায় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার উন্নতি ও চিরকল্যাণ বিধান করুন্।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীমতী [illegible] কর্ত্তৃক ৩২ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 666. —— February, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৬ সংখ্যা।	মাঘ, ১৩২৫। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯।	১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

ঊননবতিতম মাঘোৎসবে ব্রাহ্মিকাসমাজে উপদেশ।

বন্ধুতে বন্ধুতে যখন সাক্ষাৎকার হয়, তখন আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, "কেমন আছ ভাই?" কেহ বলে, "ভাল আছি, ভাই! তুমি ভাল আছ তো?" কখনও বা শুনি, একজন বলিতেছেন—"আর কি বলি, ভাই, বিপদ্ যে আর কাটে না!"

মুখের দিকে চাহিয়া যদি কাহাকেও একটু শীর্ণ দেখি, অমনি ব্যস্ত হইয়া স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করি। কারণ, আমরা জানি, স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইলেই শরীর জীর্ণ, মুখ নিষ্প্রভ হয়।

আজ আমার সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, "কেমন আছ বোন্, কেমন আছ?" আজ বাহ্য শিষ্টাচার, মৌখিক ভদ্রতা, কপট হাস্য দূর করিয়া এক মায়ের সন্তান আমরা সকলে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করি।

উদাসীন ভাবে আজ উত্তর দেওয়ার ও লওয়ার দিন নহে। আজ কেবল বাহিরের কথা নয়, ভিতরের কুশলও জানিতে চাই। আমরা এ-জগতে কেবল দেহখানা লইয়াই কি আছি? দেহ সুন্দর, দেহ বিধাতার পবিত্র দান, রক্ষা ও যত্ন করিবার জিনিষ; কিন্তু ঐ দেহের আচ্ছাদনে যে মানুষটি ঢাকা আছে, তাহার খবর কি?

যে সুখ দুঃখ দেহের উপরে দেখা যায়, সে তো খানিকটা মাত্র; সমস্ত সুখ-দুঃখ কি আমরা বাহিরে দেখিতে পাই? চক্ষের জ্যোতিতে, অধরের হাস্যে, কণ্ঠের স্বরে, দেহের গতিতে ও ভঙ্গীতে যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়, তদপেক্ষা গভীর আনন্দ তাহার নিভৃত অন্তরে সঞ্চিত আছে। মলিন মুখে, জীর্ণ বস্ত্রে যে-দৈন্য ধরা পড়ে, তাহা হইতে সহস্রগুণ মলিনতা ও দারিদ্র্য, হয় ত, তাহার গুপ্ত অন্তরকে লজ্জা দিতেছে।

আজ সভ্যসমাজের অনুকরণে কেহ এ-কথা বলিও না, "আমার গুপ্ত দারিদ্র্য, আমার নিভৃত বেদনার কথা জানিবার তোমার অধিকারই বা কি, আবশ্যকতাই বা

কি?" আজ তো আদান-প্রদানের দিন; আজ জননীর গৃহে মিলিয়া পরস্পরের অভাব পূরাইয়া লইবার দিন। আজ সকলের দৃষ্টি বিশ্বজননীর দৃষ্টিতে মিলাইয়া আমাদের সৌভাগ্যের সঙ্গে, মহত্ত্বের সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে, উন্নত অধিকারের সঙ্গে হীনতা, দুর্ব্বলতা ও জড়তা চিনিয়া বুঝিয়া লইবার দিন। তাই দৃষ্টি আজ খুলুক;—আত্ম-দৃষ্টি। তোমার খুলুক, আমার খুলুক, সকলের খুলুক।

তরুণ-বয়স্কারা, তোমাদের মুখে কি আনন্দ, প্রাণে কত আশা। ওগো, জরাজীর্ণ দেহের সঙ্গে যাহাদের আশা স্তিমিত হইয়া আসিতেছে, রোগ-শোকের আঘাতে যাহারা অতিমাত্র জর্জ্জরিত, তোমাদের আনন্দ, তোমাদের আশা-ভরসা তাহাদের মধ্যে একটু সঞ্চার কর। তাহাদের দুঃখের অভিজ্ঞতা-টুকু লও, তোমাদের দীপ্ত দুর্দ্দম সাহসের ভাগ তাহাদিগকে দাও। আজ দিবার দিন, লইবার দিন; আজ হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবাহ সঞ্চারিত হউক্।

আজ উৎসব করিবে বলিয়া কেমন সুন্দর নববস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছ! পিতা বা স্বামী কত আদর করিয়া তোমাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছেন! বড় আনন্দেরই কথা। কিন্তু ভিতরের দিকেও একবার চাও।—সেখানেও কত সৌন্দর্য্য আছে, আরও কত সৌন্দর্য্য সঞ্চয় করা যায়? কত অসুন্দরতা মুছিয়া ফেলা যায়? কাহারও মন কি ঈর্ষ্যায় মলিন, রূপগুণের অহঙ্কারে স্ফীত, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে মত্ত, ক্রোধে ও অ-ক্ষমায় অশোভন? তাহার প্রাণ আজ নূতন প্রেমে উজ্জ্বল হউক্, সকল অবিনয় ও ঔদ্ধত্য সরিয়া যাউক্। আজ সকলের দিকে চাহিয়া সকলে আনন্দিত হই, আজ ভালবাসার ঐশ্বর্য্যে সকলেই মহিয়সী হই। ভালবাসার দ্বারা কি-ই না গড়া যায়? এমন জিনিষ যে আর নাই! আত্মার জন্য আশা, সাহস, কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা এবং করিবার সামর্থ্য, সবই ভালবাসায় আসে। অন্যের ভিতরকার সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষু, আর দোষ ক্ষমা করিবার শক্তি, ভালবাসাই দেয়। এস, আজ মায়ের ভাণ্ডার হইতে ভালবাসা লুটিয়া লই; বাঁটিয়া দিই, প্রেমময়ী জননী দেখুন্।

আজ তো সাজিবার দিন। আজ কত-জনে হয়তো রং মিলাইয়া কাপড় পরিয়াছেন। আজ-কাল যাহারা পারেন, পরণের শাড়ী, গায়ের জামা, পায়ের মোজা, হাতের রুমাল, এমন কি অলঙ্কার পর্য্যন্ত এক-রঙ্গা করিয়া পরেন্। আজ এই রুচি ভিতরের দিকে লইয়া যাইতে অনুরোধ করি। ওগো ব্রাহ্ম-গৃহের কন্যারা, তোমাদের মুখের কথা, মনের চিন্তা, আর হাতের কাজ মিলাইয়া পর; তোমাদের শিক্ষার সঙ্গে তোমাদের দৈনিক ব্যবহার মিলাও, তোমাদের আদর্শের সঙ্গে তোমাদের সমস্ত জীবনখানা এক-রঙ্গা হউক্। তোমরা নারী, সৌন্দর্য্যের দিকে তোমাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ; সকলে ভিতরে ভিতরে সুন্দর হও। সৌন্দর্য্য ভাল বাস বলিয়া সুন্দর হও, তোমাদের সৌন্দর্য্য প্রিয়জনকে সুখী করে বলিয়া সুন্দর হও। ভিতরের সৌন্দর্য্য বাহিরেও যে ফুটিয়া উঠে। প্রদীপের আলোতে তাহার আধারটিও উজ্জ্বল হয়।

আমি দর্শন-বিজ্ঞানের বড় কথা বলি

পারি না, কিন্তু গোটা কত মোটা কথা জানি, আর তাহাই বলিতে পারি। আমি জানি একথা সত্য যে, ভিতর মধুর হইলে বাহিরও মিষ্ট ও সুন্দর হয়। এই রোগ, শোক, আশা ও আনন্দের জগতে কোথায় না সৌন্দর্য্য আছে? যদি কেহ সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতে চাও এবং আপনার ভিতরে উহা সঞ্চয় করিতে চাও, ভিতরের দিক্‌টা অবহেলা করিলে চলিবে না। সত্য বলিতেছি, সৌন্দর্য্য বাহিরে পাইলেও আনন্দটা বাহিরের জিনিষ নয়। তাহার উৎস অন্তরে। আনন্দ যদি না পাইলাম, না দিলাম, সকল সৌন্দর্য্য-চেষ্টা ব্যর্থ। যেখানে প্রেম নাই, ভক্তি নাই, সেখানে আনন্দও নাই; সেখানে সৌন্দর্য্য মৃত।

সংসারে রোগ, শোক, দারিদ্র্য আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু জ্ঞানময় আনন্দময় বিধাতা এই রোগ, শোক, মৃত্যু ও নানা অভাবের মধ্যেই আনন্দের বীজ বপন করিতেছেন। দুঃখ যে অপরিহার্য্য, মানুষের পক্ষে অতীব আবশ্যক। অন্ধকার যে আলোকেরই পরিচয় দেয়, মৃত্যু যে জীবনকে জানিবার জন্য, যত্ন করিবার জন্য আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তোলে; বেদনা যে চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করে, শক্তিকে বিকাশ করে, আনন্দকে চিনাইয়া দেয়। ঘরে ঘরে দুঃখ, সেই—দুঃখের পরিচয় লইয়া, একলা মানুষ তাহার একলার দুঃখ ভুলিয়া গিয়া সকলের আনন্দে আনন্দিত হইতে চায়। বস্তুতঃ সে তো একলার নয়, সে যে সকলের। ক্রমে সে সুখ-দুঃখ নিয়তি-সূত্রে অবিচ্ছিন্ন জানিয়া, দুঃখকে সঙ্গে লইয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহার ভয় হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া তাহাকে নবজীবনের পথে আপনার বাহন করিয়া লয়!

কৃশা গোতমীর গল্প অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। শিশু-পুত্রের শোকে কাতর হইয়া এই নারী বুদ্ধের নিকট গিয়া বলিল, "প্রভু, আমি বড় দুঃখিনী, আমার এই একটি পুত্র আমার জীবনের সর্ব্বস্ব। ইহাকে হারাইয়া আমি কিরূপে বাঁচিব, জানি না। প্রভু, তুমি ইহাকে বাঁচাইয়া দাও।" বুদ্ধ বলিলেন, "আমি ইহাকে বাঁচাইবার একটি মাত্র ঔষধ জানি, সংগ্রহ করিতে পারিবে কি?" নারী বলিল, "আদেশ করুন্ প্রভু, আমি যেখান হইতে হয়, ঔষধ-সংগ্রহ করিব।" বুদ্ধ বলিলেন, "আমাকে মুষ্টিমাত্র সর্ষপ আনিয়া দাও; কিন্তু দেখিও, যে গৃহে পিতামাতা, ভাইবোন্, দাস-দাসী কেহ মরে নাই, এমন গৃহ হইতে আনিবে, তাহা না হইলে ঔষধের ফল হইবে না।" শোকে উন্মত্তা সেই নারী সরিষা ভিক্ষা করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিল। এক এক গৃহে যায়, আর বলে, "একমুষ্টি সরিষা দাও গো, একমুষ্টি সরিষা।" যেমন সরিষা আনে, সে জিজ্ঞাসা করে, "ওগো, এ ঘরে কেহ মরে নাই তো? মা-বাপ, ভাইবোন্, পুত্রকন্যা, দাস-দাসী, কেহ মরে নাই তো?" গৃহস্থ বলে, "সে কি কথা! কেউ মরে নাই, এমন ঘর তো এ নয়।" সেই নারী সারাদিন ঘুরিয়া নগরে যত গৃহ আছে, সব গৃহে একই উত্তর পাইল। এমন ঘর নাই, যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করে নাই। তখন তাহার চৈতন্যের সঞ্চার হইল। সে বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "প্রভু, এমন গৃহ নাই, যেখানে মৃত্যু যায় নাই; আমার ঔষধ আনা ঘটিল না। তুমি এখন

আমাকে মৃত্যু হইতে মুক্তি-লাভের উপায় বল।”

আজ এই আনন্দের দিনে মৃত্যু শোক লইয়াও তো কত নারী উপস্থিত আছি; কৃশা গোতমীর মত মৃত্যু হইতে মুক্তির উপায় প্রার্থনা করিতেছি। আনন্দ-স্বরূপ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মের স্পর্শে মৃত্যুর আকৃতি-প্রকৃতিও যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাহা কি আমাদের মধ্যে কেহ অনুভব করেন নাই? মৃত্যু যে দৃষ্টি খুলিয়া দিয়া প্রিয়জনকে সুন্দরতর করে, নিকটতর করে! এখান হইতে যে গেল, তাহার সন্ধানে দৃষ্টি চালিত করিয়া আমরা যে অপর-লোকের একটু আভাস পাই। বিশ্বজননীর অনন্ত কোলে হারাধনকে খুঁজিতে গিয়া তাঁহার ক্রোড়ের স্পর্শটা অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তাঁহাকে বিদায় দিলে, আর কাহাকেও কাছে পাই না বলিয়া তাঁহাকেই শক্ত করিয়া ধরিতে চাই।

তাঁহার স্পর্শ কি কেবল দুঃখের দিনেই চাই? রোগ ও মৃত্যুর বেদনার ভিতরেই চাই? সুখ, স্বাস্থ্য ও সম্পদের মধ্যে কি তাঁহার আবশ্যকতা নাই? তাহা নয়, তাহা নয়। সুখ, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সকলই যে অস্থায়ী। তাঁহাকে ছাড়ি বলিয়া আরও অস্থায়ী। যদি আনন্দ এবং শান্তি পাইতে হয়, সুখ, দুঃখ, সকল অবস্থাতেই হৃদয়ের মধ্যে আনন্দময়ের জন্য একটু স্থান রাখিতে হইবে। দৈনিক জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের, জ্বালা-যন্ত্রণার, চিন্তা-চেষ্টার মধ্যে মাঝে মাঝে লুকাইয়া আসিয়া তাঁহাকে আত্ম-নিবেদন করিয়া যাইতে হইবে। আমরা দুর্ব্বল, সুখেও শ্রান্ত ও অশান্ত হইয়া পড়ি। মাঝে মাঝে সেই স্পর্শমণিকে ছুঁইয়া গেলে, অশান্তি ও অস্বস্তি দূর হইবে।

নারীর জীবন সহস্র খুঁটিনাটী লইয়া ব্যস্ত ও বিব্রত। তাহাকে ছোট বিষয়ের পশ্চাতে অনেক ছুটাছুটী করিতে হয়। কেবল সেই অনন্তের স্পর্শেই ছোট চেষ্টা একটা বড় ব্রত, একটা দুশ্চর তপস্যার অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার আলোকেই জীবনের ছবি সাদা-কালো রেখাতে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠে।

আজ এই সম্মিলনে যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নূতন গৃহ গড়িয়া উঠিতেছে, কাহারও অনেক দিনের অনেক প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত সাধের সংসার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সকলেই আনন্দময়ী জননীর ক্রোড়ে বসিয়া, নূতন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি, তাঁহার ক্রোড়ে ইহলোক পরলোক সম্মিলিত। তাঁহার স্নেহ সকলেরই জন্য। সকলের অটল অনন্ত আশ্রয় তিনি। আমরা তাঁহার সেই প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে ভরা মূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া জীবনের ব্রত-পালন করিতে ফিরিয়া যাই। তিনি আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীকামিনী রায়।

আঁধার সাঁঝে।

আঁধার সাঁঝে আকাশ মাঝে
কোন্ তারাটি জ্বলে গো—
কোন্ তারাটি জ্বলে?
শুপ্ত কোণে সুপ্ত সাগর
মুক্ত হয়ে চলে গো—
মুক্ত হয়ে চলে।
কাহার প্রেমের মলয় হাওয়া
উড়িয়ে দিল সকল চাওয়া?
উদার আঁখির পরশ-পাওয়া
বক্ষ আমার দোলে গো—
বক্ষ আমার দোলে!
কে গো আমার ভাঙা গানে
রাঙিয়ে দিল অগ্নি-বাণে?
সদ্যঃসুধায় মদ্য পানে
চরণ কেন টলে গো—
চরণ কেন টলে!
আঁধারে যা' ছোট ছিল,
আলোর মালায় তা' বাড়িল,
জীবন সমাদরে দিল
মরণ-মাল্য গলে গো—
মরণ-মাল্য গলে!
আমার কান্না, আমার হাসি,
বাজায় তাহার হাতের বাঁশী,
সেই লহরে বিশ্ব আসি'
লুটায় চরণ-তলে গো—
লুটায় চরণ-তলে!

দরবেশ

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বারাণসীর বাসিন্দার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। তাহারা একটী স্থান লইয়া বাস করে। সেই স্থানটী বাঙ্গালি-টোলা নামে খ্যাত। বিদ্যায় ইহারা হিন্দুস্থানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বাঙ্গালি-টোলায় অনেকগুলি মন্দির আছে। এই পল্লিটীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। কিন্তু বাঙ্গালিগণ কেদারেশ্বরের মন্দিরেই অধিক যাইয়া থাকে। কেদারেশ্বরের অন্য একটি নাম কেদারনাথ। মন্দিরের বারান্দায় অনেকগুলি দেবতা আছে। প্রধান মন্দিরটী চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। দ্বারদেশে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত দুইটী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। ইহারা দ্বারপাল। মূর্ত্তি দুইটী দেখিতে অতিচমৎকার। প্রত্যেক মূর্ত্তিরই চারিটী হাত আছে। তাহাদিগের এক হস্তে ত্রিশূল, দ্বিতীয় হস্তে গদা, তৃতীয় হস্তে পুষ্প এবং চতুর্থ হস্তটী খালি। এই চতুর্থ হস্তটী যেন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে যাত্রিগণকে বলিতেছে; যে, "তোমরা এখানে অপেক্ষা কর; দেবাদেশ প্রাপ্ত হইলে ভিতরে যাইও।" মোট কথা এই যে, একদল লোক মন্দিরে প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায় এবং যতক্ষণ না তাহা উদ্ঘাটিত হয়, ততক্ষণ ভিতরে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায় না।

মন্দিরের বহির্ভাগে সম্মুখের দেওয়ালে যাট্‌টী দীপ দিবার জন্য দীপাধার আছে। সন্ধ্যাকালে সেগুলিকে তৈল-সংযুক্ত করিয়া প্রজ্জলিত করা হয়। মন্দিরের মধ্যে কেদারেশ্বরের মূর্ত্তি অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ যে, কেদার নামে এক ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ ঋষির সহিত হিমালয়ে যাইয়া মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হন্। তাহার মৃত্যু হইলে, শিব তাহাকে দেবত্ব অর্পণ করেন্। সুতরাং, মহাদেবের মূর্ত্তিতে তাহার পূজা হইয়া থাকে। বশিষ্ঠকে স্বপ্নে মহাদেব দেখা দিয়া বর-গ্রহণ করিতে বলেন। বশিষ্ঠ এই বর চান যে, তিনি (মহাদেব) যেন বারাণসী-ধামে বাস করেন।

কেদারেশ্বরের সহিত অন্যান্য দেবতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা লক্ষ্মীনারায়ণ, ভৈরবনাথ, গণেশ ও অন্নপূর্ণা। যে দ্বার দিয়া ঘাটে অবতরণ করা যায়, তাহার উপর বাঙ্গলা ও হিন্দিতে কেদারেশ্বরের মাহাত্ম্য লেখা আছে। মন্দিরের বহির্ভাগে অনেক দুঃস্থ নরনারী ভিক্ষা-প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। এবিষয়ে কেদারেশ্বরের মন্দিরটী অন্নপূর্ণার মন্দিরের সমতুল। শেষোক্ত মন্দিরেও দরিদ্র ব্যক্তিগণ ভিক্ষা-প্রত্যাশায় গমন করে। সিঁড়িতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার স্থান আছে। নিম্নে একটী কূপ দৃষ্ট হয়। ইহা গৌরীকুণ্ড নামে খ্যাত। ইহার জলে জর আরোগ্য হইয়া থাকে বলিয়া লোকদিগের বিশ্বাস।

কেদারনাথের মন্দিরের পশ্চিমে প্রায় সিকি মাইল দূরে মান-সরোবর নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার চতুর্দ্দিক্ মন্দির-দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে অন্যূন পঞ্চাশটী মন্দির আছে। প্রত্যেক মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক একটী আছেন। এতন্মধ্যে রাম-লক্ষ্মণের মন্দিরটীই প্রসিদ্ধ। কুলুঙ্গিতে দত্তাত্রেয়ের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইনি অত্রি ঋষির পুত্র। দুর্ব্বাসা ইহার ভ্রাতা। রাজা মানসিংহ মান-সরোবরের খনন-কর্ত্তা। এখানে প্রায় এক সহস্র দেবতা দৃষ্ট হইয়া থাকেন্।

মান-সরোবরের নিকটে পূর্ব্বদিক্‌স্থিত দ্বারের একটী রাস্তার কোণে দুইটী মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে বালকৃষ্ণ ও অন্যটী চতুর্ভুজ। এখান হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই মানেশ্বরের মন্দির দেখা যায়। রাজা মানসিংহ ইঁহার প্রতিষ্ঠাতা।

বাঙ্গালীটোলায় মান-সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। লোকের বিশ্বাস, ইনি প্রত্যহ তিল-পরিমাণে বর্দ্ধিত হন্। দেবতার সমক্ষে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী বৃষ জানু পাতিয়া বসিয়া আছে। মন্দিরের দ্বারের দুইপার্শ্বে অনেকগুলি দেবতা আছেন্; তন্মধ্যে একটির্ নাম শ্যাম কার্ত্তিক। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের কুলুঙ্গিতে অনেক দেবতাই আছেন্। একটী কুলুঙ্গিতে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বিষ্ণুর পদচিহ্ন তিনটী সর্প দেবতা, তিনটী মহাদেব ও একটী গণেশের মূর্ত্তি দেখা যায়। অন্য কুলুঙ্গিতে মহাদেবের মূর্ত্তিটী ঠিক্ মনুষ্যের ন্যায়। এরূপ বিগ্রহ প্রায়ই দেখা যায় না। মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তিই প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

যে স্থানে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির অবস্থিত, তথায় একটী অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষে একটী বৃহৎ মূর্ত্তি ঠেসান দেখা যায়। ইনি বীরভদ্র-নামে খ্যাত। ইঁহার চতুর্দ্দিকে অন্যূন ত্রিশটী দেবতা আছেন্। কয়েক পদ

দূরে একটী নিম্ববৃক্ষের তলে অষ্টভুজা দেবী অবস্থিত।

কেদারনাথের মন্দির হইতে দশাশ্বমেধের মন্দিরে যাইতে হইলে রাস্তায় অনেক দর্শনীয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। তুলারেশ্বরের মন্দিরটী দেখিবার উপযুক্ত। সাতুবাবু-নামক জনৈক বাঙ্গালীবাবু এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করেন। অত্যুচ্চ মন্দিরটী মধ্যে অবস্থিত এবং তাহার দুইপার্শ্বে সাতটী করিয়া মন্দির আছে। এই সমস্তগুলিতে শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নদীতটস্থিত চৌকীঘাটে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; তাহার চতুষ্পার্শ্ব চবুতরা-দ্বারা বেষ্টিত। এই স্থানটীতে অনেকগুলি দেবতা আছেন্। এখানে কতকগুলি সর্পমূর্ত্তিও দেখা যায়। অশ্বত্থ বৃক্ষের সমক্ষে রুক্মেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে অনেক মন্দিরই আছে।

বাঙ্গালিটোলায় সর্ব্বাপেক্ষা অনেক দেবতার অবস্থিতি।

* * * *

বারাণসীর দুর্গাবাড়ীর প্রসিদ্ধি অধিক। অনেকেই এখানে আসিয়া দেবীর পূজা করে। সহরের দক্ষিণ-সীমায় মন্দিরটী অবস্থিত। দুর্গাদেবীর সমক্ষে বলিপীঠ আছে। নাটোরের রাণী ভবানী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। এখানে মঙ্গলবারে একটী করিয়া ক্ষুদ্র মেলা হয়। সংবৎসরের মধ্যে শ্রাবণমাসের মঙ্গলবারেই অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। দুর্গাবাড়ীর পার্শ্বেই বাঁদরের বড় আড্ডা। বাঁদরগুলি আহার পাইয়া থাকে। অবশ্য সেই আহার যাত্রিগণই দেয়।

দুর্গাদেবীর মন্দিরের দরজার সমক্ষে নহবৎখানা আছে। প্রত্যহ তিনবার দেবীর সম্মানার্থ বাজনা বাজিয়া থাকে। দেবীর মন্দিরের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিলেই দুইটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহের বামদিকে গণেশের মূর্ত্তি। শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত মহাদেবের ও বৃষের মূর্ত্তিও এখানে দৃষ্ট হয়।

মন্দিরের উত্তর দিকে দুর্গাকুণ্ড অবস্থিত। দেবীভাগবতে লেখা আছে, যখন ভগবতী রাজা সুবাহুর উপর প্রসন্না হ'ন্, তখন রাজা এই প্রার্থনা করেন যে, 'হে দেবি! যতদিন কাশী-নগরী রহিবে', ততদিন আপনি উহার রক্ষার্থ দুর্গা-নাম ধারণ করিয়া সেথায় থাকিবেন্।' উত্তরে দেবী বলেন যে, 'যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন আমি কাশীতে থাকিব।' দুর্গাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে কুরুক্ষেত্র তালাও নামে একটী পুষ্করণী আছে। রাণী ভবানীই এই পুষ্করিণীর খনন-কর্ত্রী। চন্দ্র-গ্রহণের সময় স্নানের নিমিত্ত এখানে অনেক জনতা হয়। ইহার পশ্চিমদিকে উক্ত রাণীর দ্বারা একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভাদাইনি-মহল্লায় কুরুক্ষেত্র-তালাওয়ের উত্তরপূর্ব্বে লোহারিক কূঁয়া নামে একটি কূপ আছে। ইহার মুখ দুইটী। রাণী অহল্যাবাই, বেহারের জনৈক রাজা এবং অমৃতরাও ইহার খননকর্ত্তা। সিঁড়ির একটী কুলুঙ্গিতে সূর্য্যের চক্র অবস্থিত। একটী চত্বরের উপর গণেশ উপবিষ্ট আছেন্। এখানে ভদ্রেশ্বরের মন্দিরও দৃষ্ট হয়। ভদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ-মাত্র।

* * *

রামনগরের কেল্লার এক মাইল দূরে বেনারসের মহারাজার রাজবাটী। এখানে

একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে একটি সুন্দর মন্দির আছে। মন্দিরটীতে অনেক শিল্পকার্য্য দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নের থাকে হস্তী ও তৎপরে সিংহের শ্রেণী আছে। প্রত্যেক সিংহ দুইটী করিয়া হস্তীর উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উপরকার তিনটী থাকে অনেক দেবতার মূর্ত্তিই দেখা যায়। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, তিনটী পৃথক্ কুলুঙ্গিতে অবস্থিত। কৃষ্ণও তথায় স্থান পাইয়াছেন; পরন্তু তিনি একা নহেন্। তাঁহার সহিত দুইটী গোপীও আছেন্। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, কুবের, ভৈরব, রাম, সীতা, হনুমান, গণেশ ও বলদেবের মূর্ত্তিও এখানে অবস্থিত। বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্রমাও বাদ পড়েন নাই। চন্দ্রমা দুইটী হরিণ-দ্বারা বাহিত শকটের উপর উপবিষ্ট আছেন। ইঁহার মস্তক হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিতেছে। নারদ গজেন্দ্রমোক্ষ কার্ত্তবীর্য্যও আমাদিগের নয়ন-পথের পথিক হয়। উপরিস্থিত থাকের কেন্দ্রস্থান হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি ও পূর্ব্বদিকে কালীর মূর্ত্তি অবস্থিত। উত্তরদিকের কুলুঙ্গিতে কৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। ইনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজবাসীগণকে ইন্দ্রের বারিবর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছেন। মন্দিরের তিনটী দ্বারের সমক্ষে, মার্ব্বেল প্রস্তরনির্ম্মিত তিনটী মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে একটীতে নন্দি (সাঁড়) মূর্ত্তি, অন্যটীতে গরুড়ের মূর্ত্তি এবং তৃতীয়টীতে সিংহ মূর্ত্তি। দ্বারের উপর ময়ূর ময়ূরী মুখো-মুখি করিয়া দণ্ডায়মান আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে দুর্গা দেবী বিরাজিত। বিগ্রহটী মার্বেলপ্রস্তর নির্ম্মিত। ইঁহার অঙ্গে স্বর্ণের অলঙ্কার পরিধানে পীতবসন। বিগ্রহের সমক্ষে একটী মেজ আছে। ইহার উপর পূজার বাসনগুলি সজ্জিত থাকে। বামদিকে আর একটী ক্ষুদ্র মেজ আছে, তাহাতে পূজার জন্য কেবল মাত্র পুষ্প থাকে। সন্নিকটে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি অবস্থিত। দুর্গাদেবীর দক্ষিণে পঞ্চবক্ত্র শিব অবস্থান করিতেছেন।

সন্নিকটে রাজা চেতসিংহকৃত একটী পুষ্করিণী ও উদ্যান অবস্থিত। পুষ্করিণীটীতে সুবৃহৎ ঘাট আছে। এখানে হাজার হাজার ব্যক্তি একত্রে স্নান করিলেও কাহারও অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রবাদ এইরূপ যে বেদব্যাস কাশীর মাহাত্ম্য দেখিয়া তাহার অনুরূপ ব্যাসকাশী সৃষ্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দৈব মায়ায় তাহার বিপরীত হইল। কাশীতে মরিলে মুক্তি হয় কিন্তু ব্যাসকাশীতে মরিলে গর্দ্দভ যোণী প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য ব্যাস কাশীতে কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে মরিবার জন্য কাশীতে আগমন করে। এই ব্যাস-কাশী রামনগরে অবস্থিত। বেদব্যাস ব্যাস-কাশীর অবস্থা দেখিয়া এরূপ বিধান করেন যে মাঘ মাসে যে ব্যক্তি ব্যাস কাশীতে তীর্থ করিতে আসিবে তাহাকে আর গর্দ্দভ যোনী প্রাপ্ত হইতে হইবে না। এই জন্য রাম নগরে সকলেই একবার ব্যাসকাশীতে তীর্থ করিতে যায়। তীর্থটী সারা মাঘ মাস হইয়া থাকে কিন্তু সোম ও শুক্র বারেই লোকের সংখ্যা অধিক হয়।

রামনগরে রাজার কেল্লায় বেদব্যাসের মন্দির আছে। গঙ্গাঘাট প্রস্থিত সিঁড়ি দ্বারা মন্দিরে গমন করিতে পারা যায়। বাম দিকের সিঁড়িতে গঙ্গার মূর্ত্তি অবস্থিত। ইনি

মকরবাহিনী। মূর্ত্তিটী শ্বেত প্রস্তরের। ইনি চতুর্ভূজা। একটী হস্ত অবনত, অপরটী উন্নত, তৃতীয়টীতে পদ্ম এবং চতুর্থটীতে কমণ্ডলু। এখানে অনেকগুলি দেবতাই আছেন। বেদব্যাসের মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। বেদব্যাসকে পূজা করিতে হইলে শিবের উপাসনা করিতে হয়।

পঞ্চকুশী রাস্তার আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দুর্গাবাড়ীর নির্ম্মাতা ও পুষ্করিণীর খননকর্ত্রী রাণীভবানী এই রাস্তাটী সংস্কার করেন। তাঁহার সময় হইতে পঞ্চকুশী রাস্তাটী ভাল অবস্থায় আছে। পঞ্চকুশী রাস্তা হিন্দুর পক্ষে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। এখানে মরিলে অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চকোশী রাস্তার পরিক্রমার ও ফল অনেক। যাঁহারা পরিক্রমা করেন তাঁহারা নগ্নপদে থাকেন—জুতা পরেন না। রাজাই হউন আর প্রজাই হউন, ধনীই হউন বা নির্দ্ধনই হউন পরিক্রমা সম্বন্ধে সকলেরই নিয়ম এক। তবে পীড়িত ব্যক্তির নিয়ম অন্য।

মনিকর্ণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া তীর্থযাত্রীগণ পরিক্রমা করিতে করিতে অসিসঙ্গমে গমন করে। এখান হইতে জগন্নাথের মন্দিরে যাইতে হয় এবং তথা হইতে "কানধাওয়া" গ্রাম পর্য্যন্ত যাইলেই পরিক্রমা শেষ হয়। ইহাই ছয় মাইল রাস্তা। পরদিবস ধুপচণ্ডী গ্রাম পর্য্যন্ত যাইলেই দশ মাইল পূর্ণ হয়। এখানে ধুপচণ্ডীর পূজা করিতে হইবে। তৃতীয় দিবসে পরিক্রমায় বাহির হইয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাইলেই ১৪ মাইলের পরিক্রমা শেষ হয়। চতুর্থ দিনে শিবপুর যাইয়া পঞ্চপাণ্ডব দর্শন করিতে হইবে। পঞ্চম দিনে কপিলধারায় সমাগত হইয়া মহাদেবের অর্চ্চনা না করিলে চলিবে না। ষষ্ঠদিনে কপিলধারা হইতে বরুণা সঙ্গম ও তথা হইতে মনিকর্ণিকা ঘাটে ফিরিয়া আসিলেই পঞ্চকুশী রাস্তার পরিক্রমা শেষ হয়। কপিলধারা হইতে মনিকর্ণিকা পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রীগণ যব ছড়াইতে ছড়াইতে যায়। ঘাটে পঁহুছিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া সাক্ষী বিনায়কের মন্দিরে যাইতে হইবে এবং পরে তীর্থযাত্রী বাটী প্রত্যাগত হইতে পারে। কতকগুলি যব "যব বিনায়কের" পূজার জন্য রাখিতে হয়। সাক্ষী বিনায়ক ও যব বিনায়ক দুইটী গণেশ মূর্ত্তি। এই দুই মূর্ত্তিই মনিকর্ণিকা ঘাটে অবস্থিত।

কানধাওয়ার কর্দ্দমেশ্বরের মন্দিরই বারানসী ধামে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও সুন্দর। হিন্দুশিল্পের পরাকাষ্ঠা এই মন্দিরে দেখা যায়। এখানে প্রায় ছয় শত শিব মন্দির আছে।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

গান—

সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেওয়া
আসবে কবে বসন্ত,
হৃদয়-বিতান ফুলে ফুলে
আবার হবে ফুলন্ত!

বিকশিবে রাকাশশী—
চিদাকাশ যাবে ভাসি,
বুকের মাঝে বয়ে যাবে
দখিন হাওয়া দুরন্ত!

ভুলে যাব দুঃখ শোক,
শীতল হবে দগ্ধ চোখ্,
গানে প্রেমে প্রাণে হৃদয়
আবার হবে দুরন্ত !

বইবে দখিন পবন ধীরে
প্রেম-তটিনীর কালো নীরে,
উচ্ছ্বসিয়া উঠিবে ঢেউ,
বাক্ হবে না স্ফূর্ত্ত ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

সেই পথে।

চল্ মন চল্ সেই পথে—
যেথা প্রতিদান তরে প্রণয় না কেঁদে মরে,
দীর্ঘশ্বাস শূন্যে নাহি যায় ;
ঠিক্ মরমের মাঝে মরমের কথা বাজে
অন্তহীন মধুর গাথায় ;
অন্তরে অন্তর মিশি হাসে ছলহীন হাসি,
বাহুতায় নাহি যায় ভুলে ;
এক সুখ, এক দুখ, এক-আশা-ভরা বুক,
ভাসে যেন এক স্রোতোজলে।

চল্ মন আরও সেই পথে—
যেথায় মোহের ছলে অন্তর না কভু ভুলে,
তুচ্ছতায় ঢলে না'ক প্রাণ ;
সামান্য নিধির তরে কর্ত্তব্য রাখিয়া দূরে
সুখে মন নহে ভাসমান ;
মদ-অন্ধকার পশি' হৃদয়ে ফেলে না গ্রাসি'
বিবেকে রাখিয়া অন্তরালে ;
স্নেহ ভক্তি দয়া মায়া মরতে অমৃত-ছায়া
না বিকায় কাঞ্চনের ছলে !

চল্ মন আরও সেই পথে—
যেথায় উন্মুক্ত হাসি দেয় সব জ্বালা নাশি'
বিষাদের নাহি ক্ষীণ ছায়া ;
মহান্ হৃদয় যেথা ঘুচায় পরের ব্যথা,
নাহি ধরে পিশাচের মায়া ;
তুচ্ছ তরে হিয়া যেথা ভুলে না'ক কৃতজ্ঞতা
দগ্ধ নয় অতৃপ্তি-শিখায় ;
বিশ্বাসের পাল বুকে চলে মন ঋজুমুখে,
কুটিল প্রবাহে নাহি যায় !

চল্ চল্ আরও দূর পথে—
নশ্বর জগতে ভুলি' প্রাণ যেথা কুতূহলী
ধায় সেই অনন্তের পানে,
জগতের সুখদুখ সকলে হ'য়ে বিমুখ
রত মন মোচনের ধ্যানে !
পৃথিবীর মায়া আসি' হৃদয়ে ক্ষণেক পশি'
নির্য্যাতন করে না তাহায়,
তন্ময় অন্তর মাঝে সুধার প্রবাহ রাজে,
ভাবে মন জগৎ-পিতায়।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

আত্ম-বিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য।

[হেমচন্দ্রের বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগ।
সুবোধ মাটীতে পড়িয়া ঘুমাইতেছে;
ধীরে ধীরে হেমচন্দ্রের তথায় প্রবেশ।]

হেম। (সুবোধকে দেখিয়া) আহা! আমার ননীর পুতুল ধুলোয় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে! বেলা দুপুর হ'য়ে গেছে, বোধ হয়, এখনও কিছু খেতে পায় নি? খিদের জালায় বাছা আমার বেহুঁশ হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। দু'দিন আগে যা'র ঘুমের জন্য কত সাধনা ক'র্ত্তে হ'ত, সে আজ মেজের উপর ধূলায় প'ড়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে! (কিছুক্ষণ পরে তিনি ডাকিলেন) সুবোধ!—আহা! অজ্ঞান হ'য়ে ঘুমুচ্ছো সাড়া নেই। ভগবান্! একি ক'র্লে? যদি এত অবনতি ঘটাবে, তবে একদিন কেন ঐশ্বর্য্যের শিখরে তুলে ছিলে? তাতেইত' আজ এত কষ্ট! তাই ত' আজ এত দুঃখ! সেই স্মৃতিইত আজ পুড়িয়ে মাচ্ছে! চিরদিন যদি এম্নি দুঃখে কষ্টে কাট্‌ত', কখনও যদি সুখের আস্বাদ না পেতুম্, তা হ'লেত আজ এ যন্ত্রণা পেতে হ'ত না। জগদীশ্বর! কেন আমাকে দীন হীন দরিদ্র কর নি? যা'রা সামান্য, দীন হীন, যারা কুলি মজুর, তারাও আজ আমার চেয়ে সুখী। স্মৃতি তাদের গত সুখ তাদের সাম্‌নে এনে জালা দেয় না। দুঃখ দুঃখ ব'লে তারা আমার মতন, স্মৃতির দংশনের জালায় চিৎকার ক'চ্ছে না! ওঃ—কি ছিলুম কি হয়েছি! লক্ষপতি ছিলুম্, ভিখারী হয়েছি! একদিনে এক কথায় ভোজ-বাজীর মতন, সব উড়ে গেল! স্ত্রীর গহনা বেচে আবার ব্যাব্‌সা আরম্ভ কর্লুম, তাও গেল! আর দিন কতক পরে পেটের ভাতের জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হ'বে! আত্মীয়, বন্ধু, লোক জন, দাসদাসী, প্রভাতের তারার মতন মিলিয়ে গেছে! কেবল সর্ব্বেশ্বর আর হরিদাস এখনও আমাকে ত্যাগ করে নি। এই হতভাগার অদৃষ্ট চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে তারাও কষ্ট পাচ্ছে। এত বল্‌ছি কিছুতেই শুন্‌ছে না। আমি কি কোর্ব্বো? যার কপালে যা আছে, তাই হ'বে। আমি আর দেখ্‌তে পারি না। দেখ্‌তে বাকিই বা কি আছে? আর কি দেখ্‌তে হবে? অন্নপূর্ণা রাঁধ্‌ছে, বাসন মাজ্‌ছে। আমার এত সাধের রমা! রমার অঙ্গ নিরাভরণ হয়েছে। সুবোধ সময়ে খেতে পাচ্ছে না। খিদের জালা বরদাস্ত ক'চ্ছে, ছেঁড়া কাপড় পর্‌ছে, তবে বাকি আর কি আছে? বাকি কেবল এখনও তারা পেটের ভাতের জন্যে হাহা করে বেড়ায় নি! তাও হবে, তাও হবে! আমি বেঁচে থেকে কি ক'রে তা' দেখ্‌বো? তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল!

(হতাশ ভাবে তিনি বসিয়া পড়িলেন। সুবোধের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পিতাকে দেখিয়া সে ছুটিয়া কাছে আসিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া সভয়ে বলিল—)

সুবো। বাবা, বাবা, ওকি? অমন ক'রে বসে রয়েছেন্ কেন? আমার বড্ড

ভয় কচ্ছে, চলুন্ বাড়ীর ভেতর চলুন্। অমন ক'চ্ছেন্ কেন, বাবা ?

(হেমচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল) ওমা, মা, শীগ্‌গির এস।)

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

অন্ন। কি হ'য়েছে, সুবোধ? অমন চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন ?

সুবো। বাবা বসে বসে আপ্‌না আপ্‌নি কি বল্‌ছেন্। আমার বড় ভয় ক'চ্ছে।

অন্ন। (হেমচন্দ্রের প্রতি) কিসের জন্যে তুমি এত আত্মবিস্মৃত হ'চ্ছ? নির্ব্বোধের মতন দিন রাত হা হুতাশ করা তোমার সাজে না। তোমার ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, তোমার মুখ চেয়ে কত সুখে আছে। তোমার এমন অবস্থা দেখ্‌লে, তাঁদের কি হবে তা'কি তুমি বুঝ্‌তে পারছ না ?

হেম। সুখ, অন্নপূর্ণা সুখ ?

অন্ন। হ্যাঁ সুখ বৈকি ?

হেম। এ যদি সুখ হয়, অন্নপূর্ণা, তবে দুঃখ কা'কে বলে ?

অন্ন। দুঃখ ? সতীর পতি-বিচ্ছেদে দুঃখ, শিশুর পিতৃ-মাতৃ-বিচ্ছেদে দুঃখ, মাতার সন্তান-বিচ্ছেদে দুঃখ, তা' ভিন্ন জগতে দুঃখ আর কিছুই নেই।

হেম। কিছুই নেই? এই যে তুমি সমস্ত দিন দেহ পাত ক'রে খেটে খুটে দু'টী শাক ভাতও পেট ভরে খেতে পাচ্ছ না, এ সুখ? কচি ছেলে সুবোধ খালি গায়ে খালি পায়ে ছেঁড়া কাপড়টী পরে বেড়াচ্ছে,—এ সুখ? সোণার পুতুল রমা শুকনো মুখে আমাদের মুখ চেয়ে চেয়ে দিন কাটাচ্ছে,— এ সুখ ?

অন্ন। হ্যাঁ, সুখ! এ পূর্ণমাত্রায় সুখ। এতদিন ধনের গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে বেড়াতুম্, তোমার সেবা কর্বার অবকাশ পেতুম্‌না; আমার কাজ দাস দাসীতে কোর্ত্তো। আজ আমি নিজের হাতে সে কাজ করে, বড় সুখ পাচ্ছি। আর রমা সুবোধের কথা বল্‌ছ? তাদেরও ত কোন কষ্ট আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা, তোমার কোল, আমার বুক, এ সকল থেকে ত' তারা বঞ্চিত হয় নি? তবে আর তাদের দুঃখ কিসের? সুখ মানুষের অন্তরে। দু'খানা গয়না গায়ে দিলেই সুখ হয় না, দুখানা ভাল কাপড় প'রে বেড়ালেও সুখ হয় না।

হেম। তবে সংসারে সুখ কিসে অন্ন-পূর্ণা? মানুষ অর্থ উপার্জ্জন করে কিসের জন্যে ?

অন্ন। সুখ কর্ত্তব্য-পালনে। পুরুষে অর্থ উপার্জ্জন করে সংসার প্রতিপালনের জন্যে। আর, আত্মীয়, বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র, প্রতিপালন করা পুরুষের কর্ত্তব্য। অর্থ না হ'লে সংসার প্রতিপালন হয় না। সুতরাং, কর্ত্তব্য-পালনও হয় না। তাই পুরুষকে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে হয়।

হেম। তবে অন্নপূর্ণা! আমার কর্ত্তব্য-পালন হচ্ছে কই ?

অন্ন। তুমি গুরু, আমি শিষ্যা, আমি অবলা আমি তোমাকে কি উপদেশ দোবো? পুরুষের দশ দশা! চিরদিন তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলে। আজ দু'দিন অর্থহীন হ'য়েছ ব'লে এত দুঃখ করা কি তোমার উচিত? ঐশ্বর্য্য কার চিরদিন

থাকে? সুখ দুঃখ সমান ভাবে, কবে কার ছিল? আমরাত ক্ষুদ্র মানুষ, স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র রাজা হ'য়ে বনে গেছ্লেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকেও বনবাস করতে হয়ে ছিল। নল, শ্রীবৎস প্রভৃতি কত রাজা ঐশ্বর্য্য হারিয়ে বনে বনে বেড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু তাত জান, তাঁরা স্বধর্ম্ম ছাড়েন্ নি! আমি আর কি বল্ব? এ সংসারে সবই ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখ কিছুই নয়, কেবল মানুষের মনের বিকার মাত্র!

হেম। আমি কি কর্ব্বো অন্নপূর্ণা! তোমাদের এ কষ্ট আমি যে চখে দেখ্তে পার্চ্ছি' না।

অন্ন। বেশ! তুমি একটা চাকুরি বাকুরি কর।

হেম। (অন্যমনস্ক ভাবে) চাকুরি? চাকুরি আমি কি কো'র্ব্বো? চাকুরি ত' কখনও করিনি, অন্নপূর্ণা! আর কেই বা আমাকে চাকুরি দেবে? 'চাকুরি দাও', 'চাকুরি দাও' ক'রে কা'র খোসামোদ কোর্ব্বো? কা'র পায়ে ধোর্ব্বো?

অন্ন। তোমাকে কারুর খোসামোদ ক'র্ত্তে হবে না। প্রফুল্ল বলেছে তুমি যদি চাকুরি ক'র্ত্তে রাজী হও, তা'হ'লে সে চেষ্টা ক'র্ব্বে। আরও বলেছে কোথায় নাকি চাকুরি খালিও আছে, চেষ্টা ক'র্লে তোমার জন্যে সে ভাল চাকুরি যোগাড় ক'র্ত্তে পার্ব্বে। তোমার মত না হ'লে আমি ত' কিছু বল্তে পারি না।

হেম। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তাই কোর্ব্বো, তোমাদের কথাই শুনবো। দেখ্‌ব, পরের গোলামী কো'র্ত্তে পারি কিনা? প্রভুর আজ্ঞা পালন ক'র্ত্তে হয় কি করে, তা' শিখ্‌বো। জীবনের নতুন পথে চল্‌তে চেষ্টা কো'র্ব্বো।

অন্ন। এতে যদি তোমার কষ্ট হয়, তবে নাইবা চাকুরি ক'র্লে? আমাদের ত' কোন কষ্ট হয়নি, বেশ চলে যাচ্ছে। তোমার যাতে মন ভাল থাকে তাই কর।

হেম। না, চাকুরি কোর্ব্বো, একবার ক'রে দেখ্‌ব। তুমি ব'ল প্রফুল্লকে।

(এই সময়ে প্রফুল্লর প্রবেশ।)

এই যে প্রফুল্ল এসেছ; ভালই হ'য়েছে। কোথায় চাকুরি খালি আছে, তুমি নাকি বলেছ, বাবা?

প্রফু। আজ্ঞে হ্যাঁ, দু'টো কাজ খালি আছে। একটা এইখানেই 'মার্চ্চেন্ট' আফিসে। মাসিক একশ' টাকা মাইনে। আর একটা শ্যামনগরের জমীদারের ষ্টেটে। জমীদারের ম্যানেজারি খালি হ'য়েছে। জমীদারের ভাই, আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড একজন উপযুক্ত লোক খুঁজ্‌ছেন। মাইনে আপাততঃ দুশো টাকা। যে মার্চ্চেন্ট আফিসে কাজটা খালি আছে তা'র সাহেবের সঙ্গে আমাদের একজন 'প্রফেসরে'র খুব ভাব আছে। আপনার যেটা ইচ্ছা, চেষ্টা ক'র্লে সেইটাই হ'তে পারে।

হেম। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তুমি শ্যামনগরের কাজটাই চেষ্টা ক'রে দেখ। সাহেবের কানমলা খাওয়ার চেয়ে স্বজাতির লাথি খাওয়াও ভাল। আমি শ্যামনগরেই যাব।

অন্ন। কেন এইখানে কা'জ কর্লে'ইত' বেশ হত! বিদেশে বন্ধুহীন দেশে একলা কি করে থাকবে?

প্রফু। তা'তে কি মা! ম্যানেজারী কাজটায় মান-সম্ভ্রমও আছে, পয়সাও আছে। কিছুদিন কাজ ক'রে আবার চলে আস্‌বেন্।

হেম। হ্যাঁ, তুমি সেইটেই দেখ।

প্রফু। আচ্ছা, আমি আজই দেখ্‌বো। কি হয়, এসে আপ্‌নাকে ব'লে যাব।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের অন্তঃপুর।

লীলার কক্ষ।

লীলা ও পরিচারিকা।)

লীলা। এ-কথা তুই নিজের কানে শুনেছিস্?

পরিচারিকা। মাইরি, বৌ-দিদি! মাইরি।

লীলা। কখন্ শুন্‌লি?

পরি। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা দাদাবাবু আজ বৈঠকখানায় শুয়েছেল না? সেই সময় সেই পোরে, না কে, একটা ছোঁড়া আছে না? সে এসে বলাবলি কচ্ছিল। এতদিন হেমঘোষ বাড়ীতে ছেল ব'লে পারে নি। হেম ঘোষের নাকি চাকুরি হ'য়েছে, সে কোন্ দেশে চাকুরি ক'র্ত্তে যাবে। সে দেশ নাকি অনেক দূর। সে চলে গেলেই মেয়েটাকে ধরে আন্‌বে।

লীলা। দূর পোড়ার মুখী!

পরি। সত্যি বল্‌ছি বৌদিদি! তোমার দিব্যি! শুনে আমার গা'টা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো!

লীলা। তুই শুনে ছিলি, তা আমাকে শোনালি কেন, পোড়ারমুখি?

পরি। ওমা! সেকি গো! এমন কথা শুনে কি কেউ চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে?

লীলা। তোর মিছে কথা। তুই দুপুর বেলা কি ক'র্ত্তে বাইরে গেছ্‌লি? তোর দাদাবাবুর কাছে না কি?

পরি। (হাসিয়া) আমায় কি আর সে বয়েস আছে গা, বৌদিদি? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে!

লীলা। কবে ধ'রে আন্‌বে, তা' কিছু শুনেছিস্?

পরি। তা' পষ্ট কিছু শুনিনি। কি বল্‌ছে ওরা শোন্‌বার জন্যে অনেকক্ষণ আড়ি পেতে ছিলুম্, তা' সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পার্‌লুম্, হেমঘোষ শীগ্‌গির সে দেশে চলে যাবে; আর সে গেলে পরেই মেয়েটাকে ধ'রে আন্‌বে।

লীলা। কত বড় মেয়ে?

পরি। তা কি আমি দেকিচি?

লীলা। দেখিস্ নি, শুনেছিস্ ত'?

পরি। অত কথা কি আর শুন্‌তে পেয়িছি? তারা ধ'রে আন্‌বার কথা বল্‌ছেন; বয়েসের কথা ত আর বলে নি! তবে আই-বুড় মেয়ে, বের যুগ্যি—সোমত্তই হবে। তোমাদের ঘরে কি আর এখন ক'চি মেয়ের বে হয়?

লীলা। না, আমাদের ঘরে বুড়ো মেয়ের বে'হয়! যাক্ সে মেয়েটা বুঝি, খুব সুন্দরী?

পরি। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! ব'ল্লে যেন স্বগ্যের পরী।

লীলা। আচ্ছা, ক'বে ধ'রে আন্‌বে ঠিক্ করে জেনে আমাকে খপর দিস্ দেখি!

পরি। কেন, তুমি কি কোর্ব্বে?

লীলা। কি আর কোর্ব্বো? আমি কালো, তাই তোর দাদাবাবুর পছন্দ হয় না। সে সুন্দর, যদি তার সঙ্গে থেকে সুন্দর হতে পারি, তাই দেখ্‌বো।

পরি। তোমার যেমন কথা! সকল তাতেই তোমার হাসি, সকলতাতেই তামাসা।

লীলা। তুই আমাকে খপর এনে দিস্‌না, আমি তোকে বখ্‌শিশ দোব। এখন তুই যা।

পরি। আচ্ছা। মা'কে এ কথা বল্‌বো কি?

লীলা। মাকে ব'লে কি হবে? মা সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বেন্ না, বকাবকি ক'র্ব্বেন্; তাতে উল্টো হবে। কাকেও বলিস্ নি। বুঝ্‌লি?

পরি। আচ্ছা।

[প্রস্থান]

লীলা। (স্বগত) স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) ছিঃ ছিঃ, এ তোমার কেমন কাজ? তুমি দিন দিন কি হ'চ্ছ? তোমার উপরে আমার যে ভক্তি কমে যাচ্ছে।—নারায়ণ! আমার মনে শক্তি দাও। স্বামীর প্রতি ভক্তি যেন না হারাই।—আমি তোমার স্ত্রী, তোমার পাপ-পুণ্যের ভাগী। তোমার এ অধর্ম্ম আমি কি ক'রে দেখ্‌বো? তোমায় কিছুতেই এ পাপ ক'র্ত্তে দোবো না। যাক্। হেমবাবু যতদিন এখানে রয়েছেন্ ততদিন কিছু কর্ত্তে পার্ব্বো না। তিনি গেলে পর, আমায় একটা উপায় কর্ত্তেই হবে।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

(হেমচন্দ্রের বাটীর দরদালান।
হেমচন্দ্র, অন্নপূর্ণা, রমা, স্থবোধ, প্রফুল্ল,
সর্ব্বেশ্বর এবং হরিদাস।)

হেম। সর্ব্বেশ্বর, হরিদাস! তোমাদের ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না। আমি চল্লুম্, এদের দে'খ।

সর্ব্বে। বাবু কিছু দিনের জন্যে বিদেয় নিতে এসেছি।

হেম। (সাশ্চর্য্যে) আঁা, সেকি? এত-দিনের পর এসময় তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। ছেড়ে কোথায় যাব বাবু? কিছু দিনের জন্ত তীর্থে যাব মনে ক'রেছি। বয়েসও হয়েছে, সব ঠিক ক'রেও ফেলেছি; নইলে আপনি যখন বিদেশে যাচ্ছেন্, আমি যেতুম্ না? কিন্তু কি কোর্ব্বো? সব ঠিক করে ফেলেছি যে!

হেম। এত দিন থেকে, আজ তুমি তীর্থে যাবে সর্ব্বেশ্বর? তবে আমার স্থবোধ-রমাকে দেখ্‌বে কে? কোন্ তীর্থে যাবে? (হরিদাসের প্রতি) হরিদাস! তুমিও কি সর্ব্বেশ্বরের সঙ্গে তীর্থে যাবে ভেবেছ?

হরি। না বাবু, আমার স্থবোধকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে পার্ব্বো না।

হেম। চুপ করে রইলে কেন, সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। আজ্ঞে, এই—

হেম। বল্‌তে কি কোনও বাধা আছে?

সর্ব্বে। বাধা নেই বাবু, তবে বল্‌লে পাছে আপ্‌নি বাধা দেন্, তাই—

হেম। তুমি তীর্থে যাবে, তা'তে আমি বাধা দিতে পারি না। তবে আমি যাচ্ছি, —এমন সময় তোমার তীর্থে যাবার কথা শুনে কিছু আশ্চর্য্য হলুম্ এইমাত্র! এদের দেখ্‌বার কেউ থাক্‌বে না, তাই বল্‌ছিলাম্। তা' যাও, তোমার উপর আমার জোরই বা কি? গরীবের ঈশ্বর সহায়। সকলে ছেড়ে গেলেও তিনি ছেড়ে যাবেন্ না।

সর্ব্বে। এ রকম নিষ্ঠুর কথা ব'লে মনে কষ্ট দেবেন্ না বাবু! সর্ব্বেশ্বরকে এমনই নেমকহারাম ঠাওরালেন্ যে সে আজ অসময়ে

আপনাদের ছেড়ে চলে যাবে? তীর্থ ত দূরের কথা, জগতে এমন কোন জিনিষ নেই যার জন্মে আপনাদের ছেড়ে যেতে পারি। আর তীর্থ! পুণ্যাত্মা আপনি, পুণ্যময় এই সংসার, এই আমার পরম তীর্থ। কাশী-বৃন্দাবন এর চেয়ে আমার বেশী বাঞ্ছনীয় নয়। তবে আপনাকে সত্য গোপন কচ্ছিলুম্ তা'র কারণ বল্লুম্, পাছে আপ্নি বাধা দেন। বাবু, আপনার মঙ্গল সাধনই জীবনের একমাত্র ব্রত। আর আপ্নার নষ্টসম্পত্তির পুনরুদ্ধার আমার প্রথম ও প্রধান সঙ্কল্প। সেই জন্মে এখন আমায় অনেক যায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে। বাড়ীতে থাকৃতে পাব না। তাই আপনার কাছে কিছুদিনের ছুটী চাইছিলুম।

হেম। তোমার এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর, সর্ব্বেশ্বর!

সর্ব্বে। ত্যাগ কোর্ব্বো? কেন? কি জন্মে? আমার নিজের সম্পত্তি একজন প্রবঞ্চকে ফাঁকি দিয়ে ভোগ কোর্ব্বে, আর আমি তাই নীরবে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো? বাবু, তা' আমি কখনও পার্ব্বো না। এর জন্যে যদি মাম্‌লা মোকদ্দমা, জাল জোচ্চুরি, এমন কি খুন খারাপি পর্য্যন্ত কর্ত্তে হয়, তাও স্বীকার।

হেম। সর্ব্বেশ্বর! সে আমার আত্মীয়, আমার ভগ্নীপতি। সে যদি আমার বিষয়-ভোগ ক'রে সুখী হয়, হোক্। তার অদৃষ্টে ছিল, সে পেয়েছে, আমার অদৃষ্টে ছিল, আমি হারিয়েছি। অদৃষ্ট কেউ খণ্ডাতে পারে না।

অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝে কোনও লাভ নেই। আর বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে বিরোধ কর্ব্বারও আমার ইচ্ছা নেই।

সর্ব্বে। বাবু—

হেম। না, আর কোনও কথা ক'য়োনা। আমার অনুরোধ অথবা আদেশ যাই বল,—তার সঙ্গে কোনও বিরোধ কোরো না। বিষয় হারিয়েছি, সে কথা ভুলে যাও। কোন কালে আমাদের যে বিষয় ছিল, সেকথা ভুলে যাও। আমিও তা' ভোলুবার জন্যেই কর্ম্মস্রোতে দেহ মন দিতে যাচ্ছি। মনে কর, আমরা চিরদিনই এম্‌নি গরীব। যাক্ এসব কথা বাদ দাও, আমার যাবার সময় হ'য়ে এল, আমার জিনিষপত্র গুছিয়ে ষ্টেষনে পাঠিয়ে দাও গে।

(ধীরে ধীরে সর্ব্বেশ্বর চলিয়া গেলেন।)

হেম। আর বেশী সময় নেই, এখনি আমাকে বেরুতে হবে, অন্নপূর্ণা।

(অন্নপূর্ণা চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন)

হেম। ছিঃ,—অন্নপূর্ণা! তুমি কাঁদ্‌ছ? আমায় হাসি মুখে বিদায় দাও। তুমি যদি কাঁদ; তবে ছেলে-পুলে কি কোর্ব্বে? আমি কি করে স্থির হব?

সুবোধ। কবে আস্‌বেন্, বাবা?

হেম। শীগ্‌গির আস্‌বো বাবা। তোমায় ছেড়ে কি বেশী দিন কোথাও থাকৃতে পারি?

সুবোধ। তবে কি ক'রে থাকৃবেন্? আমি আপ্নার সঙ্গে যাবো।

হেম। আমার সঙ্গে কোথায় যাবে বাবা! আমি যে অনেক দূর দেশে যাব।

সুবোধ। সে কতদূর বাবা? আমি চল্‌তে পার্ব্বো না?

হেম। সে পাহাড় পর্ব্বতের দেশ,

জঙ্গলের দেশ, তুমি কি সে দেশে যেতে পার?

(সুবোধ হেমচন্দ্রের হাত লইয়া নিজের মুখে ঢাকা দিল।)

হেম। একি বাবা, সুবোধ! তুমি কাঁদ্‌চ কেন? কান্না কিসের? আমি আবার শীগ্‌গিরই আসব। (স্বগতঃ) একি মোহ? এদের কষ্টের জন্যেইত যাচ্ছি, বিদেশে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে, তবে প্রাণ এমন করে কেন? এত ভাব্‌না হয় কেন? এদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না যে! ভগবান্! তুমি এদের দেখ। তুমি এদের রক্ষা কোরো।

অন্ন। বিদেশে যাচ্ছ, খুব সাবধানে থেক, সর্ব্বদা চিঠি লিখ, বেশী দিন থেক না, শীগ্‌গির চলে এস।

হেম। আসব। রমা, তবে যাই মা?

রমা। বাবা, এ পর্য্যন্ত কখনও আপনার কাছ্ছাড়া থাকিনি, বাবা, বড় প্রাণ কেমন কর্চ্ছে, আপনাকে যেতে দিতে ইচ্ছে কর্চ্ছে'না। মনে হচ্ছে, যেন কি অমঙ্গল ঘট্‌বে। (কাঁদিতে লাগিলেন)

অন্ন। ছিঃ—রমা! ওকথা কি বল্‌তে আছে, মা!

হেম। হরিদাস! তোমাকে কোন কথা বলা আমার বাহুল্য, তবু বলি ভাই, আমার রমা সুবোধ রইল, দেখ। আমার রমা সুবোধকে তোমার দিয়ে যাচ্ছি।

হরি। কোন ভাব্‌না নেই বাবু, আমি প্রাণ দিয়ে ওদের রক্ষা কোর্ব্বো। দিনরাত ভেবে ভেবে আপনার শরীর, মন, খারাপ্ হয়ে যাচ্ছে, তাই আপনাকে যেতে দিচ্ছি, নইলে আমার একটুও ইচ্ছে নেই যে, আপনাকে সে-দেশে যেতে দিই।

হেম। বাবা, প্রভুন্ন! আমি চল্লুম, এরা থাক্‌বে তুমি দেখ। আমার আত্মীয় বন্ধু আর কেউ নেই। আমার ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে সব গিয়েছে।

প্রদ্যু। সেজন্যে আপ্‌নার কোন চিন্তা নেই। যতদিন পর্য্যন্ত আপ্‌নি বাড়ীতে ফিরে না আস্‌বেন্, ততদিন আমি প্রাণপণে এঁদের সেবা কোর্ব্বো।

হেম। রমা, মা আমার! সুবোধ, বাবা! যাই তবে? আমার গাড়ীর সময় হয়ে এল।

(সুবোধ ও রমা পিতাকে প্রণাম করিল)

হেম। অন্নপূর্ণা! তোমাকে বেশী আর কি বল্‌ব? তুমি বুদ্ধিমতী, যতদিন আমি ফিরে না আসি, ততদিন তোমারই উপর সকল ভার। খুব সাবধানে থাক্‌বে।

অন্ন। (স্বগতঃ) পাষাণী আমি পয়সার জন্যে স্বামীকে কোন্ দূরদেশে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছি। (প্রকাশ্যে) চল, লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রণাম কর্ব্বে চল।

হেম। চল।

(সকলের প্রস্থান। পট-পরিবর্ত্তন। লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের মন্দির। হেমচন্দ্র, অন্নপূর্ণা ও রমা।)

অন্ন। এই নাও লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের প্রসাদী ফুল। নারায়ণ তোমাকে সর্ব্বত্র রক্ষা কর্ব্বেন্।

হেম। দাও। (ফুল গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রণাম করিলেন্।)

রমা। (করযোড়ে)

জয় জয় কৃষ্ণ, কংস দমন,
বিপদ্-ভয়-ভঞ্জন !
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন, শ্রীমধু সূদন
রাধিকা-হৃদয়-রঞ্জন !
জয় বিপিন-বিহারী, মুকুন্দ, মুরারী,
শ্যাম-সুন্দর, ভব-ভয়-হারী,
অগতির গতি, হে দেব শ্রীপতি !
ভকত বৎসল ব্রহ্মসনাতন !
মিনতি ও-পদে, ফেলনা বিপদে,
কৌস্তুভ-ভূষণ, নন্দ-নন্দন !

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

যেওনা হেলায় চলে !

বিশাল নভের ওই একা প্রভাকর প্রায়,
তুমি যে উজলি ছিলে প্রাণ-মন সমুদায়।
ক্ষণেক আড়াল হলে দিবাকর বাদলায়,
সমগ্র ধরণী রহে কি আঁধারে হায়। হায় !
আরাম-সুখের মূল জরা-ব্যাধি-অপহারী,
কে রহে বিশ্বেতে আর তারি মত উপকারী ?
ধরা সদা নত হয়ে করে ওই পদ ধ্যান,
নানা ছন্দে বেদমন্ত্রে গাহে নিত্য যশোগান।
তুমি যে আমার প্রভো ! জীবনের রবি সম
একাই হাজার রূপে নাশ যত অমা-তমঃ।
তব অদর্শনে নাথ ! কি যাতনা বুক জুড়ে,
কেমনে বুঝাব হায় ! আজি যেগো বড় দূরে !
না পাই প্রবোধ হেন যা' লয়ে বাঁধিয়ে প্রাণ,
মুছিব নয়ন-ধারা ভুলিব বিষাদ-গান।
ভেবেছিনু এতদিন হও তুমি দয়াধার,
আজি হেরি তব সম নাহিক নিঠুর আর !
যখন নিকটে ছিলে ঢেলে দিয়ে প্রেমধারা,
ভুলাইলে মন-প্রাণ করিলে আপনা-হারা।
দূরে গিয়ে এবে হায় ! একি তব ব্যবহার,
হৃদয় দহিয়া যায় নাহি বিন্দু দয়া আর !
প্রেমময় ! দয়াময় ! আমার হৃদয়-ধন !
কোন্ অপরাধে বল আজি দাসে বিস্মরণ ?
মোর যে কিছুই নাই, তুমিই সংবল-সার,
তোমার চরণ বিনা লুটাইব পদে কার ?
যত দুঃখ দিবে দাও, যেওনা হেলায় চলে,
জুড়াব সকল জ্বালা তোমার চরণ তলে। *

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

উপন্যাসিকের বিপদ্।

(১)

আদিত্যবাবুর স্ত্রী অনিমা স্বামীর নব-প্রকাশিত উপন্যাস-"মৃগতৃষ্ণার" সমালোচনা পাঠ করিতেছিল। মাসিক পত্র "সত্যপ্রকাশে" তাহার সমালোচনা বাহির হইয়াছে। সমালোচক লিখিয়াছেন—"উপন্যাস-জগতে আদিত্যবাবু এইবার নবযুগ আনয়ন করিলেন। বইখানির আগাগোড়া সবটুকুই নিখুঁত ভাল হইলেও, একমাত্র নারীচরিত্র—

* এই কবিতাটী লেখিকার অন্তিম রোগ-শয্যায় লিখিত ও অপ্রকাশিত "বৈশাখী" কাব্য হইতে সঙ্কলিত।

অতুলনীয়। নারীচরিত্র চিত্রণে আদিত্যবাবু যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন,—ভয়, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, সহ্যশক্তি, ধৈর্য্য, অন্তরের ব্যর্থ হাহাকার, তৃপ্তির বিমল উচ্ছ্বাস প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল নারীচিত্তের অপূর্ব্ব উদাহরণ এমনই স্বাভাবিক ভাবে ফুটাইয়াছেন যে, তাহার তুলনা নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, একমাত্র আদিত্যবাবু ছাড়া এমন লেখা আর কাহারও লেখনী হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই, বুঝি, হইবেও না।" ইহা পাঠ করিয়া ঘোর অবজ্ঞাভরে মাসিক পত্রখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া, অণিমা শূন্যনেত্রে জানালার বাহিরে কপিশ বর্ণযুক্ত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

আদিত্যবাবুর নাম শিক্ষিত সমাজে সম্মানের সহিতই উচ্চারিত হইয়া থাকে। আজকাল প্রায় সকল মাসিক পত্রেই তাঁহার লেখা, উপন্যাস, ছোটগল্প, কিছু না কিছু বাহির হইতেছে। বাঙ্গালা "মাসিকে"র সমধিক আদর বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে। সেই একটিমাত্র লেখকের লেখার আশায় পাঠিকারা সারামাসটি উৎকণ্ঠা, আগ্রহে কাটাইয়া, দ্বিতীয়মাসের ১লা তারিখ হইতেই পথচাহিয়া বসিয়া থাকেন্। কেহ কেহ নাকি "ডাক" পৌঁছাবার পূর্ব্বেই সাংসারিক কাজ যথাসাধ্য সারিয়া রাখেন।—পাছে পত্রিকা পাইলে কাজের ঝঞ্ঝাটে পাঠে বিলম্ব ঘটিয়া যায়,—তাই এ সাবধানতা। এখন এমন হইয়াছে, মাসিকপত্র পাইলেই পাঠকপাঠিকা আগেই সূচীপত্রে নামের তালিকা দেখিয়া লয়েন, "আদিত্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ে"র নাম আছে কি না। যে বার তাহা না থাকে, সে-মাসের পত্রিকাখানি পাঠিকাবর্গের কাছে শুধুই নীরস নয়, একেবারে মূল্যহীন হইয়া যায়। এ অবস্থা যে শুধু অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেই তাহা নহে, উপন্যাস বা গল্প-প্রিয় নর-নারী-চিত্তই এখানে সহানুভূতিতে সমবদ্ধ।

অনবরত মাসিকপত্রের খোরাক যোগাইয়া আদিত্যনাথের কল্পনার গতি যখন মন্থর হইয়া আসিতেছিল, তখন তাঁহার অপেক্ষা পত্রিকা-সম্পাদকদের অবস্থা বড় কম শোচণীয় হয় নাই। উৎসাহ দিয়া,—তাগিদ্ দিয়া অনুরোধ জানাইয়াও তাঁহারা আদিত্যবাবুর "ভাবের ঘরে" প্রয়োজনানুরূপ মাল জমাইতে পারিতেছিলেন না। বই ছাপা লইয়া "পাব্লিসার"দের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। দুই বৎসরে চারিখানি উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়া গেল—নবীন লেখকের পক্ষে এ কি কম সম্মান! যশের নেশায় আদিত্যনাথের লেখার সাধও ক্রমশঃই বৰ্দ্ধিত হইতেছিল, এমন কি ইহারই সাধনায় তাঁহার স্নানাহারের সময় কুলায় না, মেজাজও সেই অনুপাতে সদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকে।

আদিত্যবাবুর স্ত্রী অণিমা শিক্ষিতা ও সুন্দরী। তাহার বাহিরের সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার অন্তরটীও বসন্তকালের কচিপাতাগুলির মতই রমণীয় নবীনতার স্ফূর্ত্তিতে ঝলমলায়মান। স্নেহ-প্রেম-দয়া-দাক্ষিণ্যমণ্ডিত অন্তরটুকু বর্ষাকালের কূলে কূলে ভরা ছোট নদীটির মতই ভরপুর। সে গৃহিণী-পণায় নিপুণা, রোগশয্যায় শিক্ষিতা ধাত্রী; আবার দ্রৌপদী বলিয়া রন্ধনেও সে পিতামহের কাছে প্রশংসাপত্র আদায় করিয়া লইয়াছে। বিবাহের

পর দুইবৎসর বড় সুখেই তাহাদের দাম্পত্য-জীবন কাটিয়াছিল। তখন অণিমার মনে হইত—পৃথিবী শুধু আনন্দের রাজ্য? ইহার কোনখানে কোন অভাব অভিযোগ, দুঃখ বেদনা, কোন মলিনতা নাই। নিজের সৌভাগ্য-গর্ব্বে পরিপূর্ণ প্রাণমন সে তাহার পতিদেবতার পায়েই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল, নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য রাখে নাই। তারপর ধীরে ধীরে তাহার সাধের ধরিত্রীর বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। এখন তাহার নয়নের হাসি অধরে নামিয়াছে; তাহাতেও বিষাদের ম্লান ছায়া ফুটিয়া থাকে। কাজকর্ম্মে সদানন্দময়ীর আর সে আনন্দভাব নাই। মিছামিছি হাসিখেলায় আর সে ছেলেমানুষি করে না! করিলে অকারণে চোখের জল এখন অনেক সময় দুর্নিবার বেগে বহিতে চায়। অনেক সময় মনে মনে সে নিজ মৃত্যু-কামনাও করিয়া থাকে। তাহার সুখের ঘরে ঘূণে বাসা বাঁধিয়াছিল। শরীরের ক্লান্তিনাশ ও মনের স্ফূর্ত্তি বিধানের জন্যে কিছুদিন হইতে আদিত্যনাথ যে নূতন ঔষধ সেবন করিতে শিখিয়াছিল, তাহা এমনি অসংযত ও অশোভনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, অনিমার অনুনয় অভিমান, ক্রোধ, ক্রন্দন, কিছুতেই আর তাহা সে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না বরং গোপনতার লজ্জা এড়াইয়া আদিত্য তাহার স্ত্রীকে এখন আর গ্রাহ্যও করে না। স্ত্রীর অল্পবুদ্ধি ও অসংস্কৃত জ্ঞানের তুলনায়, অনেক সময় অনুকম্পার সহিত সে, তাহাকে আহা বেচারি এই রূপই মনে করিয়া থাকে। কখন বা সে তাহার স্ত্রীর প্রত্যেক ভাব-ভঙ্গিমাটি ভাবের রঙ্গে রাঙ্গাইয়া লেখার তূলিকাতে আঁকিয়া তুলে। স্ত্রীর হাসি-ক্রন্দনের রৌদ্রবৃষ্টির মধুর অভিনয়—মান-অভিমানের করুণ দৃশ্য—আদিত্যকে ব্যথা না দিয়া আনন্দ দেয়। কখনও অত্যধিক যত্নসোহাগে কখনও বিরক্তি-তাচ্ছীল্যে, কখন অত্যন্ত কাছে টানিয়া, কখন বা নিজের প্রতি অকারণে পত্নীর সন্দেহের উদ্রেক করাইয়া নারী-হৃদয়ের গোপন-মাধুর্য্য,—প্রতারিতার মর্ম্মবেদনা, ঈর্ষাপরায়ণার মনের ভাব,—সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া সে 'নোট' করিয়া রাখে। জীবন্ত আদর্শের অনুসরণে এই শক্তিশালী নবীন লেখক যে নারীচিত্র-চিত্রণে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে কাহাকেও দ্বিধা-গ্রস্ত হইতে দেখা যাইত না।

ঘরের বাহিরে জুতার শব্দ থামিবার পূর্ব্বেই অণিমা দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার শরীরের মধ্যে একটা আনন্দের বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল; আসন ছাড়িয়া শান্ত-কণ্ঠে সে কহিল, "এত দেরী"? স্ত্রীর প্রশ্নে উত্তর না দিয়া, হাতের ছড়ি ও মাথার টুপী টেবিলের উপর রাখিয়া আদিত্য কহিল, "—ওঃ কি গরমই পড়েছে?" হাতের তাল-পাতার পাখাখানি একটু জোরে জোরে চালাইয়া অণিমা কহিল, বাবা ত কতবারই আমাদের যাবার জন্যে লিখ্‌লেন্ তা তুমি যাবে না ত? শিমলেয় এখন ত সময় ভালই! "স্ত্রীর অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠস্বরে আদিত্য তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। সংসারের অনেক ছোট, বড় জিনিষকেই সে যেমন তীক্ষ্ণ অন্তর-ভেদী দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখে, তেমনি করিয়াই সুন্দরীর হাসিমুখে কেমন

ভ্রূতগতিতে বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল; স্ত্রীর কথায় উত্তর-স্বরূপ কহিল, "চেষ্টা কর্‌ব পূজার সময়! তুমি ত জান, তাঁর সঙ্গে আমার মত্‌ কখনও মিল্লো না! গেলে আমিও সুখ পাব না, তিনিও না! নৈলে ক্ষতি কি ছিল আর!"

অণিমা গলা ঝাড়িয়া সহজ সুরে কহিল, "জল খাবে চল। কাপড় বদ্‌লাবে না?" আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে হাই তুলিয়া আদিত্য উত্তর করিল, "না,—খাবও না, কাপড়ও বদ্‌লাব না। তা'র কারণ, এখুনি আমায় আবার বেরুতে হ'বে।" অণিমা বলিল, "খাবে না কেন? কোথাও খেয়েচ বুঝি?" অণিমার স্বর সংশয়পূর্ণ। আদিত্য কহিল "না, খাইনি কোথাও।" তদুত্তরে অণিমা বলিল, "তবে খাবে না কেন?—সেই ছাই ভস্ম খেয়েচ বুঝি?" স্ত্রীর বিরক্তিপূর্ণ মুখের পানে সগর্ব্ব দৃষ্টিপাতে স্বামী বিজয়ী বীরের মত উত্তর দিল, "কিছু,—কল্পনাকে সতেজ কর্ত্তে দুর্ব্বলমস্তিষ্কে এটা যে কত উপকারক—তা যদি একটুও বুঝ্‌তে; তা হলে এমন্‌ নেইআঁকড়ে তর্ক কর্‌তে চাইতে না।" অণিমা রাগরক্তমুখ ফিরাইয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "থাক্‌—ও আর আমার বুঝে কাজ নেই।" কথা ফিরাইবার ইচ্ছায় আদিত্য কহিল, "বাঃ, তোমার নূতন চুড়ি দিয়েগেছে যে দেখ্‌চি!—খাসা মানিয়েচে ত?" "কিন্তু এর বিল যখন আস্‌বে তখন আর খাসা মনে হবে না। বলেছিলাম ত আমার ও-সব চাইনে!—অণিমা ঐ কথা বলিলে আদিত্য "ওঃ তাতে কি", বলিয়া, মৃদু হাসিয়া পত্নীর অভিমানপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া পুনরায় কহিল, "তোমায় খুসীকর্‌তে এ কি এমন বেশী অনি!"—অণিমা কহিল, "আমায় খুসী কর্‌তে চাও তুমি? সত্যি বল্‌চ? তবে ও ছাইভস্ম খাও কেন?" আদিত্য ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া কহিল, "বলেচি ত', কিন্তু তুমি যে আজ বড় সাজ্‌গোজ্‌ করে বসে আছ? কোথাও যাবে না কি? না, আস্‌বে কেউ?" অণিমা স্বামীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া শান্তভাবে কহিল, "আমার মনে হচ্চে আজ আমাদের বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাবার কথা ছিল না?" আদিত্য বলিল, "ওঃ, হোঃ, তাই ত—একদম ভুলে গেছি যে!—কিন্তু আজ ত আর হোল না, তা—রমেশ যাচ্চে, আমার সঙ্গে সঙ্গীত-সমাজে, রাতে তার বাড়ী নিমন্ত্রণও আছে, ফির্‌তে ঢের রাত হ'বে আমার। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পোড়ো। কখন্‌ ফির্‌ব কিছুই ঠিক নেই ত।" অনিমা অভিমান ভুলিয়া মিনতির স্বরে কহিল, "বাঃ সে হ'বে না। আজ আমি সারাদিন ধরে খাবার টাবার সব তৈরি কল্লুম, তুমি খাবে না? সে হবে না।" "মাপ্‌ কর্‌তে হচ্চে আজ কিছুতেই খেতে পার্‌ব না, আর একদিন আবার কোরো তখন! রমেশের বোন্‌ নিজেহাতে আজ রান্না করে খাওয়াবেন্‌, খেয়ে গেলে ভারী রাগ কর্ব্বেন্‌। শণিবার চেঞ্জে যাওয়াই ঠিক্‌ করা গেছে,—গদাধরকে বোলো আমার গরমের সুটটুট্‌গুলো যেন ইস্ত্রী করিয়ে রাখে। ফির্‌তে মাস দুই দেরী হতে পারে, শীতের কাপড় কিছু বেশী সঙ্গে থাকাই ভাল। সারাদিনের পরিশ্রম-যত্নে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের শোচনীয় পরিণামকল্পনা

করিয়া অণিমার মনে যে দুঃখের মেঘ জমা হইয়া উঠিতেছিল, অনুকূল বাতাসে তাহা মুহূর্ত্তে সরিয়া মুখখানা উজ্জল হইয়া উঠিল। হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে সে কহিল, "কোথায় যাব আমরা?" "আ-ম-রা" বলিয়া আদিত্য অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "না, আমি একাই যাবো, তোমার যাওয়া ত' হ"চ্ছে না।" "একলা থাক্‌তে পার্‌বে?" বলিয়া অণিমা স্বামীর পানে ফিরিয়া চাহিল। আদিত্য একটুখানি ভাবিয়া কহিল, "তা চলে যাবে এক রকম। অসার কল্পনা জাগিয়ে তুল্‌তে, দুর্ব্বল মস্তিস্ক স্নিগ্ধ রাখ্‌তে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, বাইরের সকল ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি নেওয়াই হয়েছে আমার দরকার। ঘরের বাইরে হিন্দুর মেয়ে ঘাড়ের বোঝা বই ত' আর কিছু নয়।" অণিমা টেবিলের উপরকার মাসিকপত্রখানি তুলিয়া নাড়াচাড়া করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "তুমিই কিন্তু বলে থাকো যে স্ত্রী চিন্তারও সঙ্গী।" বক্রকটাক্ষে মাসিকপত্রের দিকে চাহিয়া আদিত্য কহিল,—"বিলক্ষণ! চিন্তা ত' তোমার কর্‌তেই হবে সেখানে। বিরহ-সম্বন্ধে এবার সেখান থেকে যা রচনা করে আন্‌বো,—সাহিত্যজগতে একেবারে তাক্ লেগে যাবে—তাতে।—তারপর একটু স্বর নামাইয়া পুনরায় কহিল, "তুমি ত' জান স্ত্রীভাগ্যে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলেই মনে করি।"

অণিমা হাতের বইখানির পাতা উল্টাইয়া কহিল, "লেখায় তুমি মেয়েদের যে রকম শ্রদ্ধা, সম্মান, অধিকার দেওয়া উচিত বল—কাজের বেলায়—!" বাক্যপূরণের অবসর না দিয়া আদিত্য বলিল, "বাঃ একেবারে অ্যানিবেসান্ত! এই ত! কতকগুলো নভেল পড়ার এই ফল! সংসারটা বইয়ের অক্ষরে ত' আর তৈরী নয়, এটা সত্যিকার; তাই পুঁথির লেখা আর সত্যিমানুষ আকাশ পাতাল তফাৎ।" অণিমা একটা ছোট রকম নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ভালবাসাও কি তাই? এও কি শুধু বইয়ের কথা? সত্যি কি কিছু নেই এর মধ্যে?"

স্বামী ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, ছ'টা বাজিতে মিনিট-পনের বাকী। ঘড়িটি যথা-স্থানে রাখিয়া গম্ভীর মুখে তিনি কহিলেন, "আজ্‌গুবি প্রশ্ন! আমার মনে হচ্ছে এ-সম্বন্ধে তোমায় আগেও অনেক কথা আমি বলেছি। ভালবাসা একটা মনোবৃত্তির বিকার,—কল্পনার ক্ষণিক মোহ,—স্নায়ুর উত্তেজনা। এর দৌলতে অর্থাৎ বর্ণনা করে হাজার হাজার টাকা অনায়াসে আমাদের পকেটে এসে তোমাদের লোহার সিন্ধুকে বা গহনা-কাপড়ে পরিণত হয়। এ একটা সাময়িক মোহমাত্র। যারা এই ভালবাসার ইতিহাস শোন্‌বার জন্য পাগল, তাদেরও সে একটা সাময়িক মোহের বিকৃত অবস্থার কাল। নদীর জল যেমন তিথি বিশেষে হু হু করে বেড়ে তটের প্রান্ত ডুবিয়ে তট ভেঙ্গে চুরে দিয়ে আবার নদীর বুকেই ফিরে যায়,—এও তেমনি মনোরূপ নদীতে ভালবাসার বান্ ডাক্‌লেও তা বেশীদিন টিকে থাকে না।" আরো একটা উপমা ঔপন্যাসিকের মনে জাগিয়া উঠিল। চলিতে গিয়া হটাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে কহিল, "সাদা কথায় বোঝাতে গেলে বলতে হয়, যেমন রেশমী কাপড়,

বেনারসী শাড়ী প্রভৃতি রোদে দিলে বা পুরোণো হ'লে তার রং চটে যায়, ভালবাসা ব্যাধিরও রং তেমনি পুরনো হলেই এরও রং চটে যায়। ভাল চিকিৎসক হলে এর চিকিৎসাও জানেন। আচ্ছা এই ছটা বাজলো, আমি এখন তা'হ'লে আসি।" অভ্যস্ত পর্য্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর বিষণ্ণ নত-মুখের পানে বারেক চাহিয়া লইয়া বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া মুখ না ফিরাইয়াই আদিত্যনাথ পুনরায় কহিল,—"যে কথাগুলো বললাম, নোট করে রেখ ত! দরকারে লাগ্‌তে পারে কখন না কখনো।"

এ রকম ফরমাইস্ অণিমাকে অনেক সময়েই খাটিতে হইয়াছে, আর কিছু নূতন নয়। তবু তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া জলের ধারা ঝরণার মত ঝরিতে চাহিতে ছিল। প্রাণ-পণে নিজের মনকে চোখ রাঙাইয়া অনেক কষ্টেই সে চোখের জল বন্ধ রাখিল। তাহার মনে হইল, তাহার বেণারসীর গোলাপী রং নিঃশেষেই সাদা হইয়া গিয়াছে।

২

জানালার গোলাপী-ছিটের পর্দার রং অন্ধকারে ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া আসিল। চাপা ঝি বাহির হইতে ডাকিয়া কহিল,—"মা, ঘরে আলো জেলে দিই, সন্ধে লেগেছে।" অণিমা তেমনি উদাস নেত্রে শূন্যে চাহিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

দ্বারের বাহিরে জুতার শব্দের সহিত পুরুষ কণ্ঠের গম্ভীর স্বর শোনা গেল,—"ঘরে যাব? না, প্রবেশ নিষেধ?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই প্রশ্নকর্ত্তা সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেই অণিমা ঘোর বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার করিতে গিয়া, পরক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া স্মিতমুখে কাছে আসিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কি ভাগ্যি! মনে পড়েছে যে বড়?" আগন্তুক বিনা আতিথ্যেই একখানি কেদারা টানিয়া লইয়া ঝাঁকিয়া বসিয়া—"মনে মনে গাঁথা সখী—ই—ই—, আমার মন হয়েছে উড়ো পাখী—উড়ো—পা-খী-ই-ই—" সুর ধরিতেই দাসী ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া বক্তাটাকে চাহিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলে, অণিমা হাসিয়া বলিল,—"গান থামান মুখুজ্যে মশাই! আপনার মনের খবর জান্‌তে ত আমার বাকী কিছু নেই। তা'পর ইন্দোর ছেড়ে হঠাৎ যে বড় বাঙ্গলা দেশে?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে কহিলেন,—হটাৎ আর কই বল? অণু, কিছুদিন থেকে তোমার দিদির কাছে এম্‌নি ভার হয়ে উঠেছে যে, সে ভার না নামিয়ে তিনি আর অন্ন-জল গ্রহণ কর্‌বেন্ না,—এমনি তাঁর কঠিন পণ। অগত্যা ছুটী নিয়ে বারুইপুরে একখানা বাড়ী ভাড়া করে তাইকে আনা গেছে। দেখা যাক্, মেয়ে দু'টোকে বিদেয় কর্‌বার কি উপায় ক'র্ত্তে পারা যায়। তা'পর তোমাদের খপর বল দেখি। অন্ধকারে একা ঘরে কি হচ্ছিল? কান্না?" "যান—কাঁদ্‌তে গেলুম কি দুঃখে?" বলিয়া অণিমা উঠিয়া পর্দা সরাইয়া জানলাগুলি ভাল করিয়া খুলিয়া বায়ু প্রবেশের পথমুক্ত করিয়া দিল। ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "বয়সে দৃষ্টিশক্তি কমে যায় সত্যি,

কিন্তু বিধাতা কাকেও একেবারে বুড়ো ক'রেই সৃষ্টি করেন না—আমারও এককালে বয়স ছিলো রে?" অণিমা কাছে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "ছিল নাকি মুখুজ্যে মশাই!—আমি কিন্তু চিরদিনই আপনাকে ঐ একই রকম দেখ্‌ছি।" মুখুজ্যে মহাশয় হাসিমুখে কহিলেন, "তা হ'লে ত' বেঁচে যেতুম্ অণি! চিরদিন একরকম দেখাটাই না কঠিন!—তোমার কথা শুনে তবু আশ্বস্ত হলুম্। সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোমায় দেখে আমার ত' ভয়ই হয়েছিল!" "কেন বলুন ত—আমি কি এমনি ভয়ানক দেখ্‌তে?" বলিয়া অণিমা দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া সকৌতুকে ব্রজেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কথার উত্তর না দিয়া দেওয়ালে টাঙ্গান একখানা বড় এনলার্জ করা ছবীর পানে চাহিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এই বুঝি তোমার সাহেব?" অণিমাকে নীরব দেখিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ উঠিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অভিনিবেশ সহকারে ছবিখানা দেখিতে লাগিলেন; কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। ছবিদেখা শেষ হইলে তিনি ফিরিয়া কহিলেন, "রাস্কেলটা না বই লেখে? তোমার দিদিত তাঁর লেখার শতমুখে স্তুতি করে থাকেন্। লোকটা লেখে ভাল তাহলে, নাঃ?" সমালোচক মাসিক পত্রখানির দিকে বক্রকটাক্ষে চাহিয়া অণিমা উদাসীন ভাবে কহিল, "দেখুন না লোকে কি বলে?" ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাখানি তুলিয়া পাতা উল্টাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানটুকু চিহ্নিত করিয়া কহিলেন, "লোকে যা ব'লে তা লোকের মুখেই শোনা যায়। তুমি কি বল, তাই আগে শুনি।" "আমি"—বলিয়া সবেগে কি একটা কথা বলিতে গিয়া তখনি আত্মসংবরণ করিয়া অণিমা কহিল, "পড়ুন্ না!"

পাঠশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ শ্যালিকার বিরক্তমুখের পানে বক্রকটাক্ষে ক্ষণেক চাহিয়া লইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"বাঃ খাসা ব'লেছে ত'? লোকটা তা হ'লে গোঁয়ার টেঁয়ার নয়,—কেমন? বেশ স্নেহময় হৃদয়বান্ স্বামী! স্ত্রীচরিত্র আঁক্‌বার এ অসাধারণ শক্তি ও যে কোথায় পেলে তাও ত আমার অজানা নয়!—এ শক্তির উৎস যে সেই ছোট বেলার ছোট্ট অণুটী, তা তার মুখুজ্যে মশাই ইন্দোরে বসে ও টের পেয়েছে। সত্যি অণু—তোমার ঘরকন্না দেখে, তোমায় দেখে, বড় সুখী হলুম্। এই চার বচ্ছরে আশ্চর্য্য বদলে গেছ তুমি! সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বাড়ে কি সে বলত;—স্বামীর প্রেমে? আদিত্য যথার্থ ভাগ্যবান্—কারণ তুমি তার স্ত্রী?" "তাতে কি আসে যায়"—বলিয়া অণিমা অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। মুখুজ্যে মহাশয় বলিল, "তাতে কি এসে যায়?—আমি বল্‌ছি, খুব এসে যায়, বাজী রাখ্‌তে রাজী আছি।" "মিছে হারবেন,—না মুখুজ্যে মশাই, তাতে আর এখন কিছু আসে না।" —এই কথা অণিমার মুখ হইতে বাহির হইলে ব্রজেন্দ্রনাথ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শ্যালিকার ভাবব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া সংশয়পূর্ণস্বরে কহিলেন,—"এখন বল্লে যে? কখন ও আস্‌ত তা হ'লে? কথাটা দ্ব্যর্থমূলক হোল কি না?" অণিমা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "চার বছর বিয়ে হোল,—বুড় হ'য়ে গেলুম,—আবার ও-সব কি? চা খাবেন্?" ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীর

মুখে কহিলেন,—"তাই ত' অণি, আমারই ভুল! চার-বচ্ছর-তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তোমরা ত' এখন তাহ'লে বুড় বুড়ী! আহা তোমার দিদির মাথায় কবে এমন সুবুদ্ধির উদয় হবে। তিনি ত তোমার চেয়ে আট বচ্ছরের বড় না?—তবু তাঁর বিশ্বাস মুক্তোর চুড়ী আর হিরের ব্রেস্‌লেটে, তাকে যেমন মানায়, দুগাছি রাঙা শাঁখা আর কস্তাপেড়ে সাড়ীতে, কিছুতেই তেমন মানাতে পারে না। তুমি, যদি দয়া করে তাঁর বানপ্রস্থের সময় উপস্থিত, এই সত্যটুকু বুঝিয়ে দিতে পার ভাই,—তাহ'লে অনায়াসেই ব্যাঙ্কের স্মরণ না নিয়ে তাঁর আয়রণচেষ্টের প্রসাদেই কন্যাদায়ে রেহাই পাই। আহা আদিত্য কি ভাগ্যবান্! থিয়েটার, বায়স্কোপে রাত কাটিয়ে এলেও তাকে বোধকরি বাড়ী ঢুকতে দরোয়ানের গলাধাক্কা খেতে বা প্রবেশ নিষেধ শুনতে হয় না।" অণিমা এবার রাগ করিয়া সত্যসত্যই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ব্রজেন্দ্রনাথ রহস্য রাখিয়া কহিলেন, "না—না—বোস। এইবার কাজের কথা! আমি যে তোমায় নিতে এলুম তার কি হবে বল দেখি? তোমার দিদি, অণু, নিরু, তেঁতুল সবাই যে তাদের মাসীমার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে! ব'লে এসেছিলুম আজই নিয়ে যাব। তা ত' হোল না, তা হলে! তোমার বেহারা বল্লে—সাহেবের ফিরতে অনেক রাত হবে। তুমি তা হ'লে ঠিক হ'য়ে থেক, কাল দুপুর বেলা এসে তোমায় নিয়ে যাব। তোমার দিদির ইচ্ছে ছুটিটা একটু লম্বা হয়,—অবশ্য উভয় পক্ষের মত থাকলে—" বলিয়া মাটিতে আস্তে আস্তে জুতা ঠুকিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলপ্রান্তটী উঠাইয়া লইতে মুখনিচু করিয়া অণিমা কহিল,—"আজই আমায় নিয়ে চলুন মুখুজ্যে ম'শাই—কতদিন দিদিকে দেখিনি, বলুন ত?" "সত্যি অণি, অনেক দিন।—সেও বড় ব্যস্ত হ'য়েছে,—কিন্তু গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামিনীকে নিয়ে পলায়ন ঠিক আইন-সঙ্গত বা ভদ্রতা-সম্মত হবে না ত! কাল নিশ্চয় আমি নিতে আস্‌বো। সাহেব বাড়ী থাকেন কোন সময়?—অর্থাৎ তাঁর দেখা পাব ঠিক কটায় এলে বল ত?" মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নে স্বামীর প্রসঙ্গে অণিমার সুপ্ত অভিমান, রাগ, দুঃখ সমস্তই আবার জাগিয়া উঠিতেছিল। সে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আজই কেন নিয়ে চলুন না! কেউ কিছু বল্‌বে না—দেখবেন্ তখন! গেলেই বা কার ক্ষতি?" ব্রজেন্দ্র ভয়ের অভিনয় করিয়া কহিল,—"সর্ব্বনাশ! অরি সাহসিকে—তুমি কি বৃদ্ধ মুখুজ্যে মশায়কে দিয়ে 'ডুয়েল' লড়াতে চাও? না—না—লক্ষ্মি আজ আর নয়, কাল! কিন্তু ক্ষতিটে কারু নেই কেন শুনি? গৃহিণী হীন গৃহ সে ত অরণ্যের সঙ্গে উপমেয়। গৃহকর্ত্তার বনবাসের ব্যবস্থা দিয়েও বল ক্ষতি নেই!" তাচ্ছীল্যে মাথা হেলাইয়া অণিমা কহিল, 'তিনি ত' যাচ্ছেন শৈলাবাসে,—বনবাস ত' আমারই ব্যবস্থা।" ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ওঃ, তাই রাগ হয়েছে,—ক'দিন থাকবে সেখানে?" "আমি তার কি জানি? যতদিন ইচ্ছে! মস্তিষ্ক শীতল রাখতে, কল্পনাকে প্রাণ দিতে মনের শক্তি সঞ্চয় কর্ত্তে প্রাকৃতিক দৃশ্যই হচ্ছে প্রধান ঔষধ। সংসারের ঝঞ্ঝাট্ থেকে মুক্ত থাকা—

সে সময় কত প্রয়োজন আপনি তা হয় ত' অনুমানও কর্ত্তে পারবেন্ না।" মুখুজ্যে মহাশয় বলিলেন "না বাবু! তা আমি পার্ল্যুম না,—তা ঐ সব করবার সময় তোমার ব্যবস্থা কি রকম হবে?—তোমায় সঙ্গে নিলেই ত' বেশ হ'ত। কল্পনার পেছনে ছুটোছুটী না করে, বাস্তবের ফটো তোলা সে ত আর ও!-" "দয়া করুণ মুখুজ্যে ম'শাই! আপনিও শত্রুতা কর্ব্বেন্ না—তা হ'লে আমি মরে যাব" বলিয়া ফিরিয়া বসায় আধ-অন্ধকারে অণিমার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল না,—তবু তাহার কণ্ঠস্বরের আর্দ্র ও আর্ত্ততায় ব্রজেন্দ্রনাথকে বিস্মিত করিয়া দিল। কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেলে প্রথমে অণিমাই কথা কহিল। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "চলুন, আজ আপনাকে আমার রান্না খেতে হবে। আমি নিজে হাতে সব তৈরী করেছি! কেবল কচুরি ক'খানা ভাজ্‌তে বাকী। আপনি বসে থাক্‌বেন্, আমি ভেজে দেবো, সব ঠিক্ করাই আছে, দেরী একটুও হবে না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

গানের স্বরলিপি।

কেদারা—মধ্যমান।

কি সুধা ওই মদির নয়নে;
মন ভৃঙ্গ আকুল লোভে ধায়, তাহারি পানে।
মরতে কি স্বরগে কোথায় আছি জানি নে;
মৃদুল মোহের ঘোর লাগিল অবশ অলস পরাণে॥

কথা ও সুর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

```
 ০              ১                                ২´                        ॥
II র্সা -া না -া। ধপক্ষাপা -ধনা -ক্ষধপা -মগা।  ক্ষপা -ক্ষপা -ধা ক্ষপা |
   কি ০ সু ০     ধা০০০    ০০    ০০০     ০০      ও০   ০০   ০ ই০

 ৩                     ০                      ১
| মা -গা গা মা  I  মা -ধা ক্ষা -পা।  -গা -মা -রা সা |
  ম  ০  দি  র       ন  ০  য়  ০      ০   ০   ০  নে

 ২´                    ৩                     ০
| -া সসা সা সমা।  -মগা গা পা পা  I  পক্ষা -া পা -া |
  ০  মন  ভৃ  ঙ্গ     ০০  আ কু ল      লো০ ০ ভে ০

 ১                          ২´                    ৩
| ক্ষপা -ধনা -ক্ষধা -পা।  র্সা না -ধা পধা।  ধনধা -পা -ক্ষপা পা II
  ধা০   ০০   ০০   য়      তা  হা  ০  রি০    পা০০  ০   ০০   নে
```

৩ ০ ১
II পা ধা পা পা I র্সা -না র্সা র্সা । -া র্সা -র্সর্র্সা -া |
ম র তে ছি শ ০ র শে ০ কো ০০ ০

২´ ৩ ০
| র্রা -র্সা -া র্রা । র্সা -া -া -া I -র্সর্সা -ধা -পা -া |
থা ০ র আ ছি ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০

১ ২´ ৩
| ক্ষা -পা -ধা পা । মা -া -গা -া । -া গা মা -ধা I
জা ০ ০ নি নে ০ ০ ০ ০ সু ছ ০

০ ১ ২´
| -ক্ষা পা -া মা । -া -গা মা -পা । গমা রা -া -মা |
০ ল ০ মো ০ ০ হে ০ র০ ঘো ০ র

৩ ০ ১
| সা সা সা -মা I -া গা পা পা I ক্ষপা ক্ষপা ধনা -ক্ষপধপা |
লা গি ল ০ ০ অ ব শ ০অ ল০ স০ ০০০০

২´ ৩
| র্সা নধা -পা -ধা । -না -ধপা -ক্ষধা পা II II
প ০রা ০ ০ ০ ০০ ০০ সে

জীবন দান।

সবাই মুখে বলে,
মস্তবড় ওস্তাদ এক গাইবে আজি গান
রাজার সভাতলে,
সন্ধ্যা হ'য়ে এলে,
দেশ-বিদেশের পুরবাসী বালক বৃদ্ধ যুবা
ছুটল দলে দলে
রাজার সভাতলে।
নানা রংয়ের বেশে
সভার মাঝে যেথায় হ'বে কালোয়াতি গান
জুটল তারা এসে।
পরে সবার শেষে
বিশাল কায় ওস্তাদ মশাই এলো ধীরে ধীরে
সিংহাসনের পাশে
যেথায় রাজা ব'সে।

সন্ধ্যা হ'লে পার
হাত পা ছুড়ে দাড়ি নেড়ে শুরু হ'ল গান
সবে বল্লে বারে বার
"আহা— সুরের কি বাহার
তালমানের জ্ঞানটা এনার রীতিমতই আছে,
তবে গানটা বোঝাই ভার,
গলাবাজিই সার।"
এমন সময় ধীরে
স্নিগ্ধ কান্তি রুক্ষ কেশ একতারাটি হাতে
কেও আসে ঘরে?
আরে—এ যে পাগলা হরে!
সবাই বল্লে;—"বাঃ আজ তোমারে গাইতে হবে গান
রাজার দরবারে।"

অনেক সাধার পরে
করুণ কণ্ঠে পাগলা হ'য়ে আত্মহারা হ'য়ে
সুরু করুল গান,
মায়ের মধুর নাম।
স্তব্ধ হ'ল সভা—সজল হ'য়ে উঠল আঁখি
শীতল হ'ল প্রাণ
শুনে হরির গুন-গান।
আবেগ ভরে রাজা গলা হ'তে মুক্তামালা খুলে
হরিরে করে দান।
হেসে বল্লে হরি ;
"কেমনে বল পরি ;
গানের রাজা আপনি আজি আছেন যেথা বসি,
মালা সাজে তারি।"
চরণ পরে পড়ি
তানসেন কন, "যে গান আজি শোনালে তুমি প্রভু
তাহারি সুরে সুরে
পরাণ গেছে ভ'রে।—
শিখেছি যে গান
বুঝিনু আজি মিথ্যা সব—নিরতার প্রতিমূর্ত্তি
কঠিন পাষাণ,
ছিল না তাতে প্রাণ।
মানবের মূর্ত্তি ধ'রে প্রভু, কোন দেবতা তুমি
তা'তে করুলে জীবন দান!"

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পিতৃবিলাপ কাব্য ও বিবিধ রচনা।—শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দত্ত, আড়ংপাড়া খুলনা। মূল্য ১৲; বাঁধাই ১।৹ মাত্র।

গ্রন্থকার পুত্রশোকাতুর প্রবীণ ব্যক্তি। তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে এরূপ একটী প্রাণমনোবিমোহিনী করুণস্বরলহরী উত্থিত হইয়াছে যে, তাহার আকর্ষণী শক্তিতে পাঠকমাত্রেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং সহানুভূতিপাশে আবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে অশ্রু-সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কবিতাগুলির মধ্যে সাক্ষাৎ শোক যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। বিধাতা গ্রন্থকারের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্ররত্নগুলিকে তাঁহার হৃদয়দেশ হইতে উৎপাটিত করিয়া সেস্থানে যে শোকের উৎস উৎসারিত করিয়াছেন, তাহার পূত স্নিগ্ধ বিমল প্রবাহের সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ ও স্তম্ভিত। এতদ্ব্যতীত পরিশেষে "বিবিধ কবিতা"-নামে যে কয়েকটী কবিতা নিবেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও ছত্রে ছত্রে কবিত্বের বিকাশ দেখিলে, হৃদয়ে আনন্দ লাভ হয়। শোকে নিপীড়িত গ্রন্থকারের ৮ মাস বয়সের শিশুর শেষদশা দর্শনে লিখিত কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল!—

প্রাণধন! মুদিছ নয়ন?
কে আর দেখাবে হায়, ডেকে ডেকে অভাগায়
রবি-শশি-তারকা-গগন!
কে খেলবে জোনাকীর সনে?
সন্ধ্যার আলোক মাখি, উড়ে যাবে নীড়ে পাখী,
—চেয়ে রবে চকিত নয়নে?
—চুপি চুপি করিবে বরণ,
আসি যবে উষা বালা, শিরে লয়ে স্বর্ণডালা,
ফুলফুল করিবে চয়ন?
কেবা বল খল খল হাসি;
প্রভাতের পানে চেয়ে, সাধা সুরে আধা গেয়ে
পরাজয়ে স্বরগের বাঁশী?
হারা হ'লে সোহাগ চুম্বন,
সুদ্ধ খেলনাগুলি, অঙ্গিনে মাখিবে ধূলি,
"পুষী" কত করিবে ক্রন্দন!
প্রাণাধিক ফিরাও বদন!
তোতা সম প'ড়ে প'ড়ে ছি ছি ছি ঘুমায়ে পড়ে,
কোন্ শিশু তোমার মতন?
আহা মরে যাই! মরে যাই!!
অই ঢুলু ঢুলু আঁখি, অভাগারে দিলে ফাঁকি
কে শুনাবে "তাই তাই তাই"?

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

১১ কল্প—২য় ভাগ।

১৩২৪ সনের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বিষয়	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
অক্ষয়-স্মৃতি (কবিতা)	শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	৩২৮
অজ্ঞাতাভাস (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৫
অদৃষ্টলিপি (গল্প)	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	১৭৪,২৫২,২৮২,৩২৫
অনুতাপ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	২৬৩
অভয় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী, বি-এ	৩৪৩
অষ্টাবক্রগীতা	শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্,এ,বি-এল, বিদ্যারত্ন	৩৫৬,৩৮৮,৪০৮
আকাঙ্ক্ষা (কবিতা)	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী	২৯৪
আত্মার অমরত্ব (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	২৮২
আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?	শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু	১৪১,২৫৬,৩৪৪,৩৭৬,৪১৬
আমি তোমারই (কবিতা)	শ্রীযুক্ত—দরবেশ	১৬৫
আয় ফিরে আয় (কবিতা)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	৬২
আলোক (কবিতা)	শ্রীমতী জগত্তারিণী দেবী	১৮৩
আসাতে (কবিতা)	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ	৮১
ঈশ্বরের অস্তিত্ব (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	৩৯২
উপাসনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১২৯
উল্টা সৃষ্টি (গল্প)	শ্রীমতী লতিকা দেবী	৫৫
এসেছে তরী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, এল্,এম্,এস্	২০৩
কন্যার বিবাহে মাতার উপদেশ	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৩৬০
কাঙ্গর দীঘি	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লালা, এম্-এ,বি-এল্	১১৯
কি নাই আমার ? (কবিতা)	স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত	৩৪৬
কে তুই আমার ? (কবিতা)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	১৮৩
গঙ্গাবন্দনা (কবিতা)	শ্রীমতী নির্ম্মলা রায়	৩১৩
গান	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩০২
গান	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এ	২৭৬,৩৮৭,৪০১

বিষয়	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	১৮,৬৭, ৯৯,১২১,১৬২,১৯৩,২৫৪,২৬৫,২৯৭,৩৩০,৩৭০,৪১৪
চক্ষুর দ্বারা মানবের পরিচয়	শ্রীমতী সুষমা সিংহ	৩৬২
ছাগশিশুর উক্তি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪৩
ছিন্নপুষ্প (কবিতা)	শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৯৯
জাতীয় উন্নতিতে ব্যক্তিগত দায়িত্ব	শ্রীমতী বসন্তকুমারী বসু	৩১৩
তপস্যা (উপন্যাস)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	১৯০, ২২৬,২৫৯,২৮৭,৩০২,৩৩২,৩৭৮
ছুর্দ্দিনে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত—দরবেশ	২২৪
নমিতা (উপন্যাস)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী	৩৮, ৬৯,৮৭,১৪৮,১৭৭,১৯৯,২৩৬,২৬৮,৩১৭,৩৪৯,৩৯৭,৪০২
নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীমতী লতিকা দেবী	১
নবস্মৃতি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত—দরবেশ	২৮০
নবীনালোক (কবিতা)	শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	৩৯২
নিবেদন (কবিতা)	শ্রীমতী বিমলাবালা বসু	২০৭
নিবেদন (কবিতা)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী	১২৩
নীরব কবি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত—	১২৯
নীরা (গল্প)	শ্রীমতী ননীবালা দেবী	১০৫
নূতন খাতা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত...দরবেশ	৩২৯
পরিচয় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	৩৪৯
পরিতৃপ্তি (কবিতা)	৺হেমন্তবালা দত্ত	২৫২
পুণ্য (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল নন্দী	১৪০
পুণ্যতীর্থ	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	২৪৯
পুস্তক-সমালোচনা	... ...	৮০,২৯৬,৩৬৪
পূজার কথা	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়	১৩,৫১
প্রতীক্ষা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	২৮৪
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৩২
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	২০৭
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীমতী বিমলাবালা বসু	৩২৮
প্রীতি-উপহার (কবিতা)	৺হেমন্তবালা দত্ত	২৬
ভারতভূমি (কবিতা)	শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী	৯

বিষয়	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভদ্রবংশের মেয়ে চিনিবার কতকগুলি লক্ষণ	শ্রীমতী সুষমা সিংহ ...	৪৩১
ভ্রমণ বৃত্তান্ত ...	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল্	২, ৪৭,৮২,১২৪,১৩৫,১৯৫
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (কবিতা) ...	শ্রীমতী সুনীতি দেবী ...	২৪৯
মহাত্মা যিশু ও তাপস হোসেন্ মন্‌সুরের জীবনে সাদৃশ্য	শ্রীমতী— ...	২৮১
মহাশ্মশানে শবের প্রতি (কবিতা) ...	শ্রীমতী নির্ম্মলা রায় ...	৪৩৬
মার্কিন-বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দৃশ্য	শ্রীযুক্ত সত্যশরণ সিংহ, বি-এস্ সি (ইলিনয়), এম্,এ,জি,এ ...	১৮৪
মিলনে (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ...	৪১
মুক্তমন্দিরে (কবিতা) ...	শ্রীমতী গুণমণি দেবী ...	৩৫৬
মৃতসংকার ...	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ সাহা ...	৬৩
যাত্রী (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী ...	৪০৮
যুদ্ধ উপলক্ষে নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার	শ্রীমতী—	৩৭২
রেবা (গল্প) ...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ...	২১১
লক্ষ্মীপূজা (কবিতা) ...	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী	১২
বঙ্গে কৃষির উন্নতি ...	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, বি-এ, বি-এল্, (বিহার-প্রদেশের কৃষিসমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও সভ্য)	১০২,১৩০,১৬৮
বড় ও ছোট (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন ...	২৮৬
বর্ষপ্রবেশ ...	... ...	১৬১
বর্ষাতি (গল্প) ...	শ্রীমতী ননীবালা দেবী ...	১৫৬
বিরহে (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত—দরবেশ ...	১২৯
বিবিধ সংগ্রহ ...	... ...	৪৩০
বিশ্বকবি ...	শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র কাব্যতীর্থ, এম্-এ ...	১২৬
বৈরাগ্য (কবিতা) ...	স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত ...	৮৬
ব্যথার দিনে (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত—দরবেশ ...	৩১৬
ব্যর্থ চেষ্টা (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় ...	৩২৫
শিক্ষিতা স্ত্রী ...	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী ...	২৪৭
শিবরাত্রি ...	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন ...	৩৬৬
শিশুরোগ ...	শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র সরকার ...	১৪৫
শীলা (উপন্যাস) ...	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	২০,৪২,১১৬,১৩৪
শোকাশ্রু (কবিতা) ...	শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী ...	৬৫

বিষয়	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
শোকোচ্ছ্বাস (কবিতা) ...	শ্রীমতী সুহাসিনী বসু ...	৭৬
শ্মশান (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন ...	৪৩৬
সংবাদ ...	...	২২৫,২৬৪,২৯৪
সাধুবচন-সংগ্রহ ...	...	২১০,২৫৮
সাধে বাদ (উপন্যাস) ...	শ্রীমতী ননীবালা দেবী ...	৪২৩
সাময়িক প্রসঙ্গ ...	... ...	৪২৯
সুখতৃষা (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	৩০৮
সুসার ও অসার (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন ...	৩৪২
সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখী (কবিতা) ...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ...	১:৬
সোনার দেশ (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায় ...	৫১
স্ত্রীর কর্ত্তব্য ...	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	২৬, ৭৭,২০৮,২৪৫,২৮৪,৩৬৩,৩৭৩,৪৩২
স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা ...	শ্রীমতী অমলা দেবী ...	১০
স্থলপদ্ম (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	৩৬৫
স্নেহের ব্যথা (গল্প) ...	শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৯
স্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা (কবিতা) ...	শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ ...	৪১৩
হতাশের গান (কবিতা) ...	শ্রীমতী লতিকা দেবী ...	৪৬
হিন্দুর তীর্থনিচয় ...	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	২৫৪, ২৭৬,৩০৯,৩৪৭,৩৯২,৪১৮
হুড্রু ফল বা সুবর্ণরেখার জলপ্রপাত ...	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে ...	১৭২

চিত্রসূচী।

১। হাবড়া ষ্টেশন ৪

২। কাশীর গঙ্গাতীর ৮

৩। বিশ্বেশ্বরের মন্দির ৪৮

৪। কাশীর মহাশ্মশান ৮৪

৫। খসরু বাগ্ ১৯৮